মায়া-মৃগ

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্‌ মার্কেট্‌
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ বি-এ
শ্রীবারিদকান্তি বসু

উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি
১৩৩২

কলিকাতা ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এক টাকা বারো আনা

যে মায়া-মৃগ জীবনে ধরা
দিতে না-দিতেই
মিলিয়ে গেছে
তারি হারিয়ে-যাওয়া
পথের উদ্দেশে—

মানুষের মনের মায়া-মৃগ যৌবনকে ঘিরে রূপের পর রূপের রেখা রচনা ক'রে চলে। তার সেই রূপের হাত-ছানিতে মানুষের মন যুগে যুগে সাড়া দিয়েছে, যুগ যুগ ধ'রেই তার এই হাত-ছানি ঘরের মানুষকে বাইরে টান্‌বে, বাইরের মানুষকে ঘরে আন্‌বে। দার্শনিক একেই মায়া ব'লে ঝেড়ে ফেল্‌তে চান, কবি এর চারিপাশ ঘিরেই ছন্দের গান রচনা করেন। 'মায়া-মৃগের' পাঁচটি গল্প এই হাতছানিরই ইতিহাস। প্রচ্ছদ-পটের পরিকল্পনাটি শিল্পী-বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের তূলির রেখায় আঁকা।

***

মায়া-মৃগ

বিদ্রোহী

পূজারী

পুরীর ডায়েরি

একটা দিনের ইতিহাস

রিক্তা

বিদ্রোহী
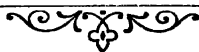
বিদ্রোহী

সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে, টিয়ে-পাখীর পালকের মতো গাছের পাতাগুলির উপর জ্যোৎস্নার ধারা সেদিন একেবারে ঢলের মতো ক'রে নেমে এসেছিল। আর সেই জ্যোৎস্নায় বাগানের শ্বেত-পাথরের মূর্ত্তিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমের দেশের রাজকন্যারা জ্যোৎস্নার ধারা ব'য়ে নেমে এসে কোন্ রূপকথার রাজপুত্রের জীয়নকাঠির স্পর্শের অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচি দিয়ে সমান ক'রে ছাঁটা

মায়া-মৃগ

মেহেদি-গাছের বেড়াটাকেও সেদিন আর বেড়ার মতো দেখাচ্ছিল না—দেখাচ্ছিল একটা মায়াপুরীর দেয়ালের মতো, যার ভিতরে ঢোকবার পথের সন্ধান কেউ কখনো পায়নি।

সেই নিস্তব্ধতা ও রহস্যের বাণীতে ভরা জ্যোৎস্নার মাঝখানে একটা বেঞ্চে পাশাপাশি এসে বস্‌লুম—আমি আর নীলা। আমার বুকের ভিতর তখন যে হাতুড়ীর আঘাত দুপ্‌দাপ্‌ ক'রে পড়্‌ছিল তার বার্ত্তা, প্রাণপণ চেষ্টাতেও নীলার কাছ থেকে গোপন করতে পেরেছিলুম কি না, সে কথা আজ হলপ ক'রে বল্‌তে পারিনে।

বেঞ্চের উপর ব'সেই নীলা আমার একটা হাত তার পদ্মফুলের দলের মতো হাত দু'টোর ভিতর তুলে' নিয়ে বল্‌লো—তোমাকে যে ফিরতে হবে শরৎ-দা।

শরৎ-বাবু হঠাৎ যে কেন শরৎ-দা'র পদবীটা লাভ কর্‌লো, তার কারণ ঠিক ধরতে না পেরে তার দিকে বিস্মিত বিহ্বল চোখ্‌ তুলে' চাইতেই সে আবার বল্‌লো—অস্বীকার ক'রো না শরৎ-দা, তোমার সমস্ত দেহটা আমাকে ব'লে দিচ্ছে এই হতভাগা দেহটার প্রলোভন তুমি জয় করতে পারছ না। কিন্তু জয় যে তোমাকে করতেই হবে। যে রূপটার দিকে তাকিয়ে তুমি আমাকে

লাভ কর্‌বার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছ, সেটা যে আজো এমন অটুট আছে তার কারণ, ও-জিনিষটা আমার পাথর হ'য়ে গেছে। যে জিনিষ পাথর হ'য়ে যায়, চোখের মাপ-কাঠিতে তার পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। কুৎসিত কদাকার ছাইগুলোও যে পাথরের চাইতে কত ভালো তা তুমি বুঝ্‌বে না—কিন্তু আমি তা বুঝি। ঋষির অভিশাপ এইজন্যই অহল্যাকে পুড়িয়ে ভস্ম করেনি—তাকে পাথর, ক'রে রেখেছিল।

আমার হাতটা হাতের ভিতর চেপে ধ'রেই নীলার কণ্ঠস্বর বেদনায় ভারী হ'য়ে থেমে গেলো। তার স্পর্শ আমার রক্তের ভিতর দিয়ে মদের নেশার মতো সঞ্চারিত হ'য়ে ফির্‌তে লাগ্‌লো!

আমি বল্‌লুম—নীলা, মনের হুকুম মেনেই আমি দরিয়ায় তরী ভাসিয়েছি। জানিনে, কূল কখনো মিল্‌বে কি না—মেলে ভালোই, না মেলে তা নিয়েও জোর-জবর্‌দস্তি কখনো কর্‌তে যাব না। মনকে যারা হুকুমে ফেরাতে পারে তাদের সাধনা আমার নেই এবং সে সাধনার জন্য আমি লোভও কখনো করিনে। আমাকে গ্রহণ করা না-করা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু ঐ ফের্‌বার হুকুমটা না দিলেও চল্‌তো।

আঘাতটা হয়তো একটু বেশী রকমের কড়া হয়েছিল। নীলার চোখের জল আমার হাতের উপর শরৎ-প্রভাতের দম্‌কা হাওয়ায় খ'সে-পড়া শেফালীদলের মতো ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে সে বল্‌লে—না, না, এ হুকুম নয় শরৎ-দা—এ আমার মিনতি,—আমার প্রার্থনা—আমার ভিক্ষা। একটা জীবন ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার দুঃখ যে কত, তা জেনেছি ব'লেই আর কারো জীবন নিয়ে খেল্‌বার সাহস আর আমার নেই। আমার জীবনের ইতিহাসটা আগে শোনো, তার পরে আমার বিচার ক'রো।

*　　*　　*　　*

নরেশ রায়কে তোমার মনে আছে কি না জানিনে। কিন্তু মনে থাকার তো কথা। কারণ, তুমি এসে আমাদের মজ্‌লিসে যোগ দেওয়ার পরেও কিছুদিন সে ছিল। আর, যে তাকে একবার দেখেছে, তার পক্ষে তাকে একেবারে ভুলে' যাওয়া আমি তো অন্ততঃ সম্ভবপর ব'লে মনে করিনে। সে ছিল একটা type, তার পায়ের গোড়ালি থেকে চুলের ডগাটি পর্য্যন্ত ছিল বৈশিষ্ট্যে ভরা। লম্বা, বাতাসে হেলে-পড়া মতো

চেহারা। অথচ তাকে দেখ্‌লেই মনে হ'তো, ঝড়ের সম্মুখে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবার জন্যই সে মরিয়া হ'য়ে রয়েছে; ঝড় তাকে ভেঙে না ফেলে হেলিয়ে দিয়েও যেতে পার্‌বে না। রঙ্‌টা তার আগুনের মতো দপ্‌দপ্‌ ক'রে জল্‌তো। বাঙালীর ভিতর ও-রকমের রঙ্‌ বড় বেশী দেখা যায় না। সব চেয়ে সুন্দর ছিল তার চোখ্‌। সে যখন চোখ্‌ তুলে' তাকাতো তখন মনে হ'তো, অকূল পাথার জলের ভিতর দু'টি নীলোৎপল সৃষ্টির প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে যেন ফুটে' উঠেছে।

ইংরেজীতে ফাষ্ট'ক্লাশ ফাষ্ট' হ'য়ে সে যেদিন কলেজ হ'তে বেরিয়ে এলো, সেই দিনই বাবা তাকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ীতে—আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে সে আমার অভ্যর্থনা কর্‌তে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেনি।

আমি তাকে কতটা ভালোবেসেছিলুম জানিনে, কিন্তু তার প্রতি হিংসেয় আমার মন যে ভ'রে গিয়েছিল তা আমি ভালো ক'রেই জান্‌তুম। পুরুষের অত সৌন্দর্য্য আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিলুম না। কেমন একটা জেদ চ'ড়ে গেলো আমার, তাকে জয় কর্‌বার জন্য

এবং জয় ক'রে জব্দ কর্‌বার জন্য। তার সুযোগ উপস্থিত হ'লে সে-সুযোগকে আমি কখনো ব্যর্থ হ'তে দেইনি।

সেদিন বর্ষার বাদল আকাশের কানায় কানায় নিকষ-কালো কেশের রাশি এলিয়ে দিয়েছে। আর তার কাজল-আঁকা চোখ্ দু'টি ছাপিয়ে যে-জলের ধারা উপ্‌চে পড়্‌ছে, তারই ঝাপ্‌টায় ধরণী ভিজে একেবারে তরুণ হ'য়ে উঠেছে। মেঘের মায়া-লোকের ভিতর মানুষের মন যে হঠাৎ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যেতে পারে, সে-কথাটা সেই দিন প্রথম আমার কাছে ধরা পড়েছিল। এই হারিয়ে-যাওয়া মন নিয়ে আমি জানালার ধারে ব'সে আছি, নরেশ-রায় এসে ঘরের ভিতর ঢুকেই একখানা চেয়ার টেনে প্রায় আমার গা ঘেঁসেই ব'সে পড়্‌লো।

আমি কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে বিদ্রূপের ঝাল্‌টা ঝাঁঝিয়ে তুলে' বল্‌লুম—কি নরেশ-বাবু, এই বাদ্‌লায় অভিসারে বেরিয়েছেন বুঝি ?

নরেশ আমার মুখের দিকে তার তারার মতো জ্বল্‌জ্বলে চোখ্ দু'টি তুলে' ধ'রে বল্‌লো—অভিসারেই বেরিয়েছি বটে, কিন্তু সে-অভিসার তোমার কাছেই নীলা, আর কারো কাছে নয়। আমি আজ তোমার পায়ের তলায় নিজেকে নিবেদন ক'রে দিতে বেরিয়েছি।

'আমি হেসে উঠে' বল্লুম—আপনি বুঝি সবে মাত্র রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতাগুলো প'ড়ে এসেছেন, আর তার ঘোর এখনও কাটেনি! কিন্তু বাস্তব-জীবনের ভিতর নরেশ-বাবু, যেখানে-সেখানে কবিতা টেনে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লে তাতে সামাজিক আইন-কানুন, বিধি-নিষেধগুলোর প্রতি বিশেষ সুবিচার করা হয় না, এটা বোঝ্‌বার বয়স আপনার হয়েছে। একলা পেয়ে আমাকে অপমান কর্‌বেন না আপনি!

আমার কথার ভিতর যে জ্বালা ছিল, বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তা চাবুকের মতো নরেশকে স্পর্শ কর্‌লো। সে বিস্ময়ে ব্যথায় গুম্‌রে উঠে' বল্‌লো—অপমান!—একে তুমি অপমান মনে কর্‌ছ নীলা! না না, এ যে আমার কেবল মুখের কথা মাত্র নয়! কথার ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত হৃদয় যে আজ বেরিয়ে এসেছে, আমার সমস্ত মন যে তোমার পায়ের কাছে আপনাকে বহন ক'রে এনেছে—আপনাকে বিকিয়ে দেবার জন্যে—কেন এই সহজ কথাটা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

তার কান্নার মতো আর্ত্ত করুণ স্বর আমার কানে পৌঁছালেও মনের দোরে ঘা দিতে পার্‌লে না। আঘাতের বেতটা সমান জোরের সঙ্গেই নিক্ষেপ ক'রে আমি

বল্‌লুম—আপনার হৃদয়টাকে আপনি যত বড় একটা চিজ ব'লে মনে করেন নরেশ-বাবু, সকলে যদি তা মনে কর্‌তে না পারে, তবে সম্ভবতঃ সেটা 'পেনাল-কোডের' কোন ধারার ভিতর পড়্‌বে না। কিন্তু আপনি বার বার আমাকে নাম ধ'রে ডাক্‌ছেন কেন বলুন তো? সে অধিকার তো আমি আপনাকে কোনো দিন দিইনি।

হঠাৎ বিদ্যুতের 'শক্' লাগ্‌লে মানুষের সব দেহ যেমন এক মুহূর্ত্তে শিথিল হ'য়ে এলিয়ে পড়ে, আমার কথার আঘাতে তার দেহটাও তেমনি ক'রে প্রথমে চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়্‌লো। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে সোজা হ'য়ে পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—All right, তার পরেই আবার বল্‌লে adieu! তার পর আর একটিও কথা না ব'লে সে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেলো।

চেয়ে দেখ্‌লুম আমি—তার মুখের ভিতর কোথাও এতটুকু রক্ত নেই। বাহিরে মেঘের বুকে যে হাহাকারটা জেগে উঠেছে, সেই হাহাকারটা যেন মূর্ত্তি নিয়ে তার চারিপাশেও জেগে উঠেছে। সে চল্‌ছে কিন্তু পা সে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ছে না,—মাতালের মতো থর্ থর্ ক'রে তার দেহ টল্‌ছে।

বিদ্রোহী

নিজের নিষ্ঠুরতায় শিউরে উঠে' আমি ডাক্‌লুম—নরেশ-বাবু—নরেশ !—কিন্তু সে-ডাক তার কাণে পৌঁছালো না।

*　　*　　*　　*

হঠাৎ নীলা স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, নীলা তো নয়—অবিকল শ্বেত-পাথরে খোদাই-করা শোকের একটি করুণ মূর্ত্তি।

চোখ্‌-ভরা এক কলস জল নিয়ে আমি বল্‌লুম—থাক্‌ নীলা,—আর আমি শুন্‌তে চাইনে।

রোদের আঁচে শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের মতো একটু ম্লান হাসি হেসে নীলা বল্‌লো—এর পরের কথাগুলো আর আমাকে বল্‌তে হ'বে না ভাই! নরেশের তিনখানা চিঠির ভিতর দিয়েই তার ইতিহাস লেখা হ'য়ে গেছে। এ-চিঠিগুলো বাক্সে রেখে আমি সোয়াস্তি পাইনে। আমার বুকের কাছে যে জায়গাটাতে কলিজার ভিতর প্রাণের ইঞ্জিনটা দাপাদাপি কর্‌ছে, তারি একান্ত নিকটে এগুলোকে রেখে দিয়েছি। সেইখানে জেগে থেকে এরা রাত্রি দিন আমাকে পাহারা দিচ্ছে। নরেশের দেহের স্পর্শ আমি কখনো পাইনি। কিন্তু তার মনের মদে যে লেখাগুলো মাতাল হ'য়ে উঠেছে, তারি স্পর্শ

মায়া-মৃগ

ফুলের বনের বুকের গন্ধ যেমন ক'রে বাতাসকে ঘিরে রাখে, তেমনি ক'রে আমাকে ঘিরে রেখেছে।

বুকের ভিতর হ'তে গাটাপার্চারের স্বচ্ছ পাতলা খাম্‌খানি খুলে' নিয়ে চিঠি ক'খানা আমার হাতের ভিতর গুঁজে দিয়ে নীলা বল্‌লে—চেঁচিয়ে পড়ো।

চিঠিগুলোর গায়ে নম্বর আঁকা—এক, তুই, তিন। প্রথম নম্বরের চিঠিখানা আস্তে আস্তে খুলে' নিয়ে আমি পড়্‌তে স্বরু কর্‌লুম—

* * *

প্রথম পত্র

ইয়োরোপের পথে—
তারিখ—খোঁজ রাখিনে।

নীলা,—ঘরের মানুষকে তুমি পথের উপর এনে দাঁড় করিয়েছ—পথ—যার শেষ নেই—সীমা নেই—যে মনের ইচ্ছার মতোই অফুরন্ত। বেদুইনের মতো অগাধ অবাধ জীবন—ঝড়ের হাওয়ার মতো দিগ্বিদিকে ছুটে' চলেছে—কখনো দিগন্তবিলীন মরু-বালুকার বুকের রেণুগুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে, আবার কখনো

বা ধরণীর কটিতটের অঞ্চলের মতো নীলের ছোঁপে-ভরা প্রান্তরের বুকের উপর দেহভারটাকে এলিয়ে দিয়ে। পাহাড় তার উদ্ধত মাথা তুলে' আমাকে ডাক্‌ছে, সহর তার কল-কোলাহলের স্তুতিগান দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌ছে।

আজ আমার আচ্ছাদনহীন মাথার উপর মেঘের মাদল বেজে উঠেছে। তার গর্জ্জানিতে ধরণীর মূর্চ্ছাহত বুকটা দুলে' দুলে' কাঁপ্‌ছে।

মেঘের বুকের এই যে গর্জ্জন—এর সঙ্গে আমার মনের গর্জ্জানির কিছু মাত্র তফাৎ নেই! ওর বুকে যে ক্ষুধা থেকে থেকে থর্‌থরিয়ে উঠ্‌ছে, সে ক্ষুধায় আমার অন্তর ভ'রে গেছে। ওর ক্ষুধার হাহাকারের আকাশ-ভাঙা কান্নার সুরে দুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তোল্‌পাড় প'ড়ে গেছে, কিন্তু আমার এ বুক-ভাঙা কান্নার হাহাকার কারো কানে পৌঁছচ্ছে না। অত বড় আকাশের বুকটাতে মেঘের এ ক্ষুধা কে জাগিয়ে দিয়েছে জানিনে, কিন্তু আমার বুকের ক্ষুধা কার চারিপাশ ঘিরে হাহাকারে ফেটে পড়্‌ছে, তা তুমিও জানো—আমিও জানি।

না গো—না—না! আমি ভিক্ষার আর্জ্জি নিয়ে তোমার কাছে দর্‌বার কর্‌তে আসিনি। ক্ষুধা আমার

যেমন তীব্র, ভিক্ষা আমার তেম্‌নি অসহ্য। তাই মাঝা-মাঝি রফার ধার আমি ধারিনে। আমার পণ—হয় জয় করবো, না হয় জয়ের যুদ্ধে মরণকে বরণ ক'রে নেবো। জয় করতে পারিনি, তাই ছুটে' চলেছি মরণের পথে। এ পথ কোথায় শেষ হ'বে কেউ তা জানে না। তবুও এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পথটা অভিসার-যাত্রার অভিনব আনন্দের মতোই আমাকে পেয়ে বসেছে। মৃত্যু-বধূর মুখের ঘোম্‌টা খুলে' তার রূপটা দেখে' নেবার জন্যে আমার মনটা আজ মেতে উঠেছে—তোমাকে পাবার জন্যে সেদিন আমার মনটা যেমন ক'রে মেতে উঠেছিল, ঠিক তেম্‌নি ক'রে।... ... ...

সমুদ্রের লীলা, তরঙ্গের দোলায় দুলে' ফেনায় ফেনায় ফুলে' উঠে' আমার পায়ের তলায় বেলা-তটের বুকের উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে। সমুদ্র, নীলা, ঠিক তোমার নীল চোখ্‌ দু'টোর মতো—তেম্‌নি নীল—তেম্‌নি উজ্জ্বল—তেম্‌নি অথই পাথার জলে ভরা। তোমার চোখের চেহারা যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লে যায়, এর চেহারাও তেমনি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে ছুটে' চলেছে। এক মুহূর্ত্তে হাসির তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, পর মুহূর্ত্তেই আবার বিদ্রূপের অট্টহাস্যে চারিদিকে ফেনার বুদ্‌বুদ্‌

ছড়িয়ে ফেটে পড়্ছে। তোমার খেয়ালী চোখ্ দু'টোর মতোই এরও খেয়ালের অন্ত নেই। এই মুহূর্ত্তে এ যাকে মাথায় তুলে' নাচাচ্ছে, পর মুহূর্ত্তেই তাকে নামিয়ে দিচ্ছে—কোথায় কোন্ অন্ধকার আবর্ত্তের আর্ত্তনাদের মাঝখানে।

হঠাৎ কেন জানিনে, ঘুরে' ঘুরে' সেই দিনের কথাই আজ মনে পড়্ছে,—যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম। সেদিনের প্রভাত আমার জীবনে যা বহন ক'রে এনেছে, তার চাইতে বড় সুখও কেউ আমাকে কখনো দেয়নি, তার চাইতে বড় দুঃখও কেউ আমাকে কখনো দিতে পার্বে না। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মনের ভিতর কোন্ প্রশ্নটা অকস্মাৎ আন্মনে জেগে উঠেছিল জানো ?—

"বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী !"

তোমার ডান হাতে সুধাপাত্র আর বাম হাতে যে বিষভাণ্ড, সেই প্রথম দেখার দিনেও আমার মনের অন্তর্যামী দেবতার কাছে সে খবরটা ছাপা ছিল না। হয়তো মনের এক কোণে তখনি পিছিয়ে পড়্বার ইচ্ছাও জেগে উঠেছিল। কিন্তু পারিনি গো—তা পারিনি।

বিদ্রোহী

তুমি জান কি না জানিনে, এক রকমের সাপ আছে যার দৃষ্টির খপ্পরে পড়্‌লে কোনো জানোয়ার আপনাকে সরিয়ে আন্‌তে পারে না। তোমার চোখেও যে সেই সাপের চোখের মায়া-কাজল কতটা ঘনীভূত হ'য়ে ছিল আজ তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আর তোমার উপর ঘৃণায় আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠ্‌ছে। তোমার স্পর্দ্ধা—তোমার বিদ্রূপ আমাকে কতবার আঘাত করেছে, আর তারি সঙ্গে-সঙ্গে কালো মেঘের ঢেউ কতদিন আমার মনের আকাশ নিবিড় ক'রে দিয়ে গেছে। ঐ বুকটার ভিতর যে উদ্ধত স্পর্দ্ধা ফণীর মতো ফণা তুলে' ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌ছে, তাকে টেনে বা'র ক'রে এনে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বার জন্যে, তার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা পায়ের তলায় থেঁৎলিয়ে দেবার জন্যে একটা দারুণ ইচ্ছা সময়ে সময়ে আমার মাথায় অঙ্কুশের আঘাত ঠুকেছে। কিন্তু তোমার ঐ বিদ্রূপের প্রলয়-ঝঞ্ঝার পিছনে যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তার মোহ্ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। তোমার সেই মায়াবী চোখের আকর্ষণের খপ্পর হ'তে আমি যে আমাকে মুক্ত ক'রে আন্‌তে পেরেছি—এ আমি আমার বহু সৌভাগ্যের ফল ব'লে মনে করি। এ মুক্তি তুমি আমাকে দাওনি—এ আমি অর্জ্জন করেছি

আমার নিজের সামর্থ্যের জোরে। আমার এ শক্তির বহর—এ স্বাধীনতার আনন্দ তুমি বুঝ্‌বে না, কিন্তু যদি আবার কাউকে খপ্পরে ফেল্‌তে পারো এবং সে যদি এম্‌নি ক'রে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে, তবে সে বুঝ্‌বে। আর যে পলে পলে তোমার খেয়ালের আগুনে আপনাকে আহুতি দিতে থাক্‌বে, সেও বুঝ্‌বে।

এর পরেও যদি আমি তোমার কাছে থাক্‌তুম নীলা, —তবে কি কর্‌তুম জানো? ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাব্‌কে আর-একবার তোমাকে সায়েস্তা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তুম—পাকা ঘোড়-সোয়ারেরা যেমন ক'রে বদমাইস ঘোড়াকে চাবুকের চোটে সায়েস্তা ক'রে তোলে।

হয়তো জিজ্ঞেস কর্‌বে—এ চিঠি তোমাকে কেন লিখ্‌ছি? কোনো কৈফিয়ৎ নেই তার। লিখেছি খেয়ালের ঝোঁকে, ডাকেও দিলুম খেয়ালের ঝোঁকেই। তোমার খেয়াল হয় পোড়ো—না হয় পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেয়ো।

—নরেশ

* *

দ্বিতীয় পত্র

প্যারি

তারিখ—১০ই মে

ফের প্যারিতে ফিরে এসেছি। লণ্ডনে আমার মন টিক্‌লো না। লণ্ডনের সেই গম্ভীর অতি-ব্যস্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর আমার মন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল—নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল। এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

ফরাসী জাতটার দিকে যতই তাকাচ্ছি, ততই এদের উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এরা কাজকে গ্রহণ করে গম্ভীর মুখে নয়—হাসি দিয়ে। জীবন ভারী পাথরের মতো এদের বুকে চেপে বসে না, হাওয়ার মতো হাল্কা পা

ফেলে' এদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। লঘু হাত দিয়ে এরা তাকে তুলে' নেয়, স্নিগ্ধ হাস্যে শেষ ক'রে নামিয়ে রাখে। অথচ তুনিয়াকে ফরাসী জাতটা কি দেয়নি? তুনিয়ার সাহিত্যের ধন-ভাণ্ডার ফরাসীর জহরতে ভরপূর, শিল্পকে এরা নূতন ক'রে মূর্ত্তি দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে, যে 'ডিমো-ক্রেসি'র হাওয়া তুনিয়ার দম্ভ ও স্পর্দ্ধার উদ্ধত মাথাকে নুইয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, এই ফরাসীর মন থেকেই তার উদ্ভব। এরা রক্তে-রাঙা মাটির উপর দিয়ে হাসির হাওয়া ছড়িয়ে চ'লে যায়, তাতে এদের লঘু নৃত্যের তাল-ভঙ্গ হ'বার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

'কাফে'তে ব'সে আছি। হঠাৎ আমার চারিদিক্ কল-হাস্যে মুখরিত হ'য়ে উঠ্লো। বাতাসে মদের ফেনার মতো নেশার আমেজ চারিয়ে গেলো। সদ্য-ফোটা হেনার মিষ্ট উগ্র গন্ধ ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়্লো।

চোখ্ ফিরিয়ে নিয়ে দেখি—সুর-সভাতলে অপ্সরীর নৃত্য সুরু হ'য়ে গেছে। অপ্সরীদের বসনাঞ্চল খ'সে পড়েছে, কবরী টুটে' বেণী এলিয়ে গেছে, হস্ত তাদের লীলায়িত। নতোন্নত দেহটাকে ছাপিয়ে তাদের অপূর্ব্ব গতি-ভঙ্গী লীলার ঝর্‌ণা ঝরিয়ে দিয়ে চলেছে।

*　　*　　*　　*

ভোগ কর্‌ছি—জীবনের পান-পাত্র পূর্ণ ক'রে আমার এ উৎসবের মদ উপ্‌চে পড়্‌ছে। বেঁচে গেছি নীলা,—বেঁচে গেছি, যে, তুমি আমাকে বাঁধ্‌তে চাওনি! কি সম্পদ্ ছিল তোমার ঐ দেহটাতে?—যার গর্ব্বে ধরাটাকে সরার মতো পায়ে মাড়িয়ে চলেছিলে; আমার সূর্য্যের মতো দীপ্ত প্রেম উপেক্ষার মেঘে ঢেকে দিতে কুণ্ঠা বোধ করনি! একবার সত্যিই মনে হ'য়েছিল, আমি দেউলিয়ে হ'য়ে গেছি, তাই তোমাকে জয় কর্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু এখানে এসে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। যাদের পায়ের কাছেও তুমি দাঁড়াতে পারো না, এমন হাজার নারী তাদের অন্তরের পান-পাত্র পূর্ণ ক'রে করুণ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে আছে। যার পান-পাত্রটা আমি চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছি সেই আপনাকে সার্থক মনে কর্‌ছে।

এই তো জীবন! এর আকাশ নীলের ছোপে ভরা—তাজা তরুণ—তারায় তারায় আলোময়। সমুদ্রের দোলার মতো এর অশান্ত অক্লান্ত দোলা শিরায় উপশিরায় রক্তের কণাগুলি নাচিয়ে দিয়ে যায়। সৌন্দর্য্য এদের পায়ের ধূলোয় প'ড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে' ওঠে, আনন্দ এদের

গায়ের বাতাসে জন্ম নেয়। এদের বুকের বাসনার ভিতরে বসন্তের সম্ভাবনা গোপন হ'য়ে আছে।

কেটি, ক্যাথারাইন, জুলি, জেস্‌মিন, নাইনী, রেনী— অন্ত নেই গো—অন্ত নেই! কারো রূপ তরল চপল বিদ্যুতের লতার মতো। আগুনের শিখার মতো আবার কেউ বা জ্বল্‌ছে—কখনো প্রদীপের মতো আলো ক'রে, কখনো বা দিক্‌টাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার্‌খার্‌ ক'রে দিয়ে। এদের সব চাইতে কাকে আমার ভালো লাগে জানো? ন্যান্সিকে। তার রূপের ভিতর জ্বালা আছে, কিন্তু জ্বালার চাইতে ঢের বেশী রয়েছে শরতের জ্যোৎস্নার করুণ স্নিগ্ধতা। সময়ে সময়ে ধরণীর ধূলো-মাটী ছাড়িয়ে সে যেন কোন্‌ জ্যোতির্লোকের মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়! তখন তাকে দেখ্‌লে আমার বাংলা-মায়ের শ্যামল-শ্রীর কথা মনে পড়ে। চোখে তার বাতাসের বুকে দিশেহারা মেঘের মতো দৃষ্টি, বুক তার দুলে' ওঠে জ্যোৎস্নার স্পর্শে সমুদ্রের বুকের মতো।

তাকে প্রথম আমি দেখেছিলুম প্যারির ফুলের একটা 'একৃজিবিশনে'। প্যারির ফুলের এই একৃজিবিশনগুলো একটা জিনিষের মতো জিনিষ—যা দেখে' চোখ্‌ জুড়িয়ে যায়—বুক ভ'রে ওঠে—কেবল ফুলের সৌন্দর্য্যে নয়—

যারা ফুলের মতোই সুন্দর, তাদের রূপের আব্‌হাওয়ায়। 'ক্রেসান্‌থেমাম'-এর থোকার মতো কারো রূপ যেন দেহের বোঁটাটার উপরে আল্‌গোছে ফুটে' উঠেছে, কারো 'ডালিয়ার' মতো লাল টক্‌টকে ঠোঁটের উপর 'প্যান্সির' হাসির মতো মিষ্টি হাসি দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। প্রজাপতি ও ভ্রমরগুলোর আনাগোনা অচল ফুলের কাছে বেশী, কি সচল ফুলের কাছে বেশী, সে কথাটা ঠিক ক'রে বল্‌বার জো নেই।

এক গাদা আধ-ফুটন্ত গোলাপের দিকে ঝুঁকে' প'ড়ে ন্যান্সি অন্যমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সম্মুখেই আর-এক থোকা বস্‌রাই গোলাপ জ্বল্‌-জ্বল্‌ ক'রে জ্বল্‌ছিল। সেই থোকাটা তুলে' নিয়ে ন্যান্সির হাতের কাছে তুলে' ধ'রে আমি ফরাসীতে বল্‌লুম— উপহার তাকে, যে রূপে বস্‌রাই গোলাপকেও হার মানিয়েছে।

স্বপ্ন হ'তে জেগে উঠে' আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ন্যান্সি আমার গোলাপের থোকায় ভরা হাত দু'টো তার হাতের ভিতর টেনে নিয়ে বল্‌লে—বিদেশী বন্ধু, তোমাকে কাফেতে দেখেছিলুম—তার পর তোমাকে কত খুঁজেছি!

*　　　*　　　*　　　*

ন্যান্সি বল্‌ছে সে আমাকে নিয়ে শীগ্‌গির ইটালিতে বেড়াতে যাবে। সেখানে হ্রদের জলে 'গণ্ডোলার' তালে তালে তার বুক যখন দুলে' উঠ্‌বে, সেই বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমোবো—না, না, সারা রাত জেগে কাটাবো। হয়তো আমার মন তখন কীট্‌সের ভাষায় গেয়ে উঠ্‌বে—

"Bright star ! would I were
steadfast as thou art—"

নরেশ—

তৃতীয় পত্র

ভেনিস—

তারিখ—শেষের দিন

নীলা,—

বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, জীবনের খোলা খাতাটা এবার গুটিয়ে নেবার দিন একান্ত আকস্মিকভাবেই ঘনিয়ে এসেছে। এতটা ঘনিয়ে এসেছে যে, হয়তো আজের বেলা-শেষের আলোর পর এ ছুনিয়ার আলোর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক থাক্‌বে না আর আমার! এই স্থন্দর ধরণীটাকে ছেড়ে যেতে মায়া হচ্ছে, কিন্তু ভয় কর্‌ছে না

একটুও। পরপারের মোহ আমাকে টান্‌ছে—কিন্তু ধরিত্রীর আলো, তার হাসি, তার কান্না—এগুলোর মায়াও তো কম নয়! ও গো, আজ তোমার কথাই বা এমন ক'রে আমার মনে পড়্‌ছে কেন বল্‌তে পারো?

আর মনে পড়্‌ছে আমার বাংলা-মায়ের কথা। বাঙালী তার দেশকে কত ভালোবাসে, মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ তা যেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আর কখনো তেমন ক'রে পারি নি। বাংলা, আমার সোনার বাংলা, শেষ বিদায়ের দিনটাতে তোমার বুকে মাথা রাখ্‌তে পার্‌লুম না মা!.........

চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে অন্ধকারের যবনিকা নেমে আস্‌ছে—পরপারের অন্ধকার—নিবিড়—ঘন—নিকষ-কালো! তার কূল নেই—শেষ নেই—সীমা নেই! যে-দিন প্রথম দরিয়ায় ভেসেছিলুম, সে দিন সমুদ্রকে যেমন অনন্ত অন্ধকারের উদ্বেলিত তুষার স্তূপ ব'লে মনে হয়েছিল, আজকার এ অন্ধকারকেও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। আজ আবার যদি আমার বাংলা-মায়ের বুকে ফিরে' যেতে পার্‌তুম!

ইয়োরোপের সব দেশের সেরা দেশ এই ইটালি। এর পত্র-পল্লবে আমার বাংলা-মার শ্যামল শোভার

আমেজ আছে, এর নারীর চোখে আমার সোনার বাংলার করুণ কোমল স্নিগ্ধ শ্রী আছে। এর সূর্য্যের আলো বিকাশের জন্য মেঘের অনুগ্রহের ভিখারী হ'য়ে ব'সে থাকে না, এর চাঁদের আলো নায়েগ্রার প্রপাতের মতো অজস্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়ে !

ন্যান্সিকে বল্‌লুম মাথার সাম্‌নের জানালাটা খুলে' দিতে। জানালার ভিতর দিয়ে আদ্রিয়াতিকের নীল জল দেখা যাচ্ছে। নৌকোগুলোর চারি পাশ ঘিরে দাঁড়ের ব'ঠের ছপ্‌ছপানির আওয়াজ কার বুকের করুণ কান্নার মতো শোনা যাচ্ছে ! দাঁড়ের ঘায়ে উছ্‌লে-ওঠা জলের কণাগুলো সূর্য্যের আলোতে জ্বল্‌ছে।

শিয়রে এসে ন্যান্সি দাঁড়ালো। পশ্চিমের গায়ে ঢ'লে-পড়া সূর্য্যের এক থোকা আলো তার বাষ্পে-ভরা করুণ মুখখানির উপর পড়ে' তারার বুকে আলোর বিন্দুর মতো জ্বল্‌ছে। আমি দুই হাতে ধীরে ধীরে তার মুখখানিকে কপালের উপর টেনে নিয়ে বল্‌লুম—জলের বুকে বেলা-শেষের আলোটা আজ ঠিক চাঁদের আলোর মতো দেখাচ্ছে। এই চাঁদের আলোতে 'গণ্ডোলায়' ভাসার কথা তোমার মনে পড়ে ন্যান্সি ?

তার আর্ত্তস্বর গুম্‌রে উঠে' বল্‌লে—ওগো থামো—

থামো। তার পর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে লুটিয়ে পড়লো আমার বুকের উপরে।

*　　*　　*　　*

কতক্ষণ সংজ্ঞা-হারার মতো প'ড়ে ছিলুম মনে নেই। হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ডাক্‌লুম—নীলা—নীলা—নীলা!—

ন্যান্সি বুকের উপর হ'তে মুখখানি সরিয়ে নিয়ে চোখ্ দু'টোর উদ্গত অশ্রুর ধারা সংযত ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌লে—What is that name darling? Who is she?

নীলা যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়,—সে যে পুরুষ হ'তে পারে না, এরি ভিতর সে কথাটা বুঝে' নিয়েছে ন্যান্সি! আমি তাকে বল্‌লুম—তোমাকেই ডাক্‌ছি Dearie! আমাদের ভাষায় নীলার অর্থ Sapphire. তোমার চোখ্ দু'টো ঠিক নীলকান্তমণির মতো কি না!

হতভাগিনীর মুখখানি একটা আকস্মিক আনন্দের আলোকে নবারুণের মতো রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। পরপারের যাত্রী প্রিয়তমের এই মিথ্যে আদরে হয়তো তার বাকী জীবনের অনেকগুলো দিনের পাথেয় সঞ্চিত হ'য়ে রইলো। ......কিন্তু বুকের ভিতর এ আমার কিসের ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চল্‌ছে?—দেহের সমস্ত রক্ত নিংড়ে বা'র ক'রে ফেল্‌বার

জন্য এ কারা মাতামাতি সুরু ক'রে দিয়েছে—একি গো—একি !.........

চেয়ে দেখি হ্যাস্নি বড় একটা গেলাস ভ'রে নিয়ে যাচ্ছে আমার তরুণ বুকের তাজা তপ্ত রক্তে। বুকের কোন্ নাড়ীটা কোন্ ব্যথার টানে ছিঁড়ে' গেলো গো !...

হ্যাস্নিকে কতবার বলেছি—রোগটা বড় ছোঁয়াচে, আমার এত কাছে সে যেন না ঘেঁসে! কিন্তু কই, সে তো শুন্‌লে না, সে তো মেরি, মরিয়ম, মার্গারেটের মতো আনন্দের পান-পাত্রটি নিঃশেষ ক'রে বসন্তের পিকের মতো আনন্দের গান শেষ করেনি! কি পেয়েছে সে আমার ভিতরে? বসন্তের আমেজ আমার জীবনের বেলা-তট হ'তে যতই স'রে পড়্‌ছে সে যে ততই আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিচ্ছে—মা যেমন ক'রে রুগ্ন মরণোন্মুখ ছেলেটিকে বুকের ভিতর টেনে রাখ্‌তে চায়। আমার হ্যাস্নি ঠিক আমার বাংলার মেয়েদের মতো!

*　　*　　*　　*

হ্যাস্নি আমার মাথায় চুমো খেলে—'রুবির' মতো তার লাল ঠোঁট দু'টো আমার ঠোঁটের উপর এলিয়ে পড়েছে—ঠিক বর্ষার প্রথম মেঘ যেমন ক'রে ধরণীর বুকের উপর এলিয়ে পড়ে। চুমোর পুলকে আমার সারা দেহ

শিউরে উঠ্‌ছে—এ শিহরণ যে থাম্‌ছে না গো—থাম্‌ছে না·········

হাত হ'তে আমার কলম খ'সে পড়্‌ছে—আবার চোখের পাতা ছেয়ে অন্ধকার নেমে আস্‌ছে।—অন্ধকার—অন্ধকার—মেঘলা রাত্রির অন্ধকার হ'তেও গাঢ়—সমুদ্রের বুকের ভিতরকার অন্ধকার হ'তেও নিবিড়! কানে ন্যান্সির বুক-ফাটা আর্ত্তনাদের ধ্বনিটা তটের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ক'রে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে।—নীলা—নীলা—নীলা······

***

*
* *

এর পর আর পাঁচ ছয় দিন নীলার কাছে যেতে পারিনি। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ঘরের ভিতর আট্‌কে প'ড়ে ছিলুম—সবে সেদিন একটু ভালো আছি। পিয়ন এক গোছা চিঠি এনে সম্মুখে ফেলে দিয়ে গেলো। একখানি নীল রঙের খামের উপর মুক্তোর মতো হাতের লেখাটা আমাকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লে। চিঠিখানা খুলে' দেখি নীলা লিখেছে—"দেখা কর্‌বার ফুর্‌সুৎ পেলাম না বন্ধু, মাফ্‌ কোরো। জীবনে নরেশের দেহের স্পর্শ পাইনি,

তাই ইটালির যে মাটি তার দেহটাকে স্পর্শ ক'রে আছে, তারি কাছ থেকে আমার আহ্বান এসেছে—সে আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না। আর যদি পাই ন্যান্সিকে!—তার দেহে হয়তো নরেশের স্পর্শ এখনো লেগে আছে! বন্ধু, সে আমার চাইতেও হতভাগিনী—কারণ সে পেয়ে হারিয়েছে!—না-পাওয়ার যে দুঃখটা আমার কাছে এতো অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, যে পেয়ে হারিয়েছে, তার দুঃখ সে কি ক'রে সহ্য কর্‌ছে!"

* * *

কালো মেঘের মতো বুকটাকে আলো ক'রে যে নীলা ফুটে' উঠেছিল—কালো মেঘের মতোই নীল সমুদ্রের ভিতর সে হারিয়ে গেছে! সে আজ দশ বছরের কথা!—তবু সে নীলের আলো আজো নিভে' যায়নি! পরপারের উপকূল থেকে তার জ্যোতির রেখাটা বুকের নিতল অন্ধকারকেও আলোর প্রতীক্ষায় ভ'রে রেখেছে—যেমন ক'রে সূর্য্যের আলোক-ধারা রজনীর অন্ধকার-গহন বুকটাকেও আলোর আভাসের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ক'রে রাখে।

পূজারী

পূজারী

গ্রামের এক টেরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে' শালপাতার ছাউনি দিয়ে ঘেরা একখানি কুটির—চাঁদের বুকের কলঙ্ক-রেখার মতো বড় সুন্দর, আয়নার মতো জ্বল্‌জ্বল্‌, স্বভাব-সুন্দরীর সযত্ন-রচিত কবরীর মতো ফিট্‌ফাট্‌—পরিষ্কার —পরিচ্ছন্ন। সেই কুটিরের বুকে আলোকের ঝিল্‌কি হেনে মহেশের ললাট-নেত্রের ন্যায় যে আগুনের চুল্লী দিনরাত জ্বল্‌তো, তারই পাশে আগুনের আলোককেও ম্লান ক'রে বাস কর্‌তো তরুণ দীপ্ত সন্ন্যাসী। জোয়ারের জলে ভরা নীল গম্ভীর সমুদ্রের মতো ছিল তার লাবণ্য—

মায়া-মৃগ

শরতের ঘন নিবিড় রৌদ্রের মতো ছিল তার তরুণ যৌবন।

কুটিরের ভিতরে শালপাতের পুঁথি এবং ভস্ম-বিভূতি নিয়েই এত ব্যস্ত থাকৃতো সে, যে বাইরের সাড়া তার কানের কাছে বড় পৌঁছাতো না। কেবল নিবিড় সন্ধ্যা নদীর ওপারে বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে তরল সোনার ঢেউয়ের মতো যখন গ'লে পড়্তো, নদী-হৃদয়ের মৃদুগুঞ্জন বিশ্ববীণার ছন্দের সাথে তাল রাখ্তে গিয়ে মাঝে মাঝে যখন বড় অধীর হ'য়ে এক-একবার কান্নার মতো ক'রে কেঁপে উঠ্তো, তখন আর কেউ তাকে ধ'রে রাখ্তে পার্তো না। সদ্য-স্নাত সন্ন্যাসী তখন রক্ত-বরণ রবির দিকে তার প্রকাণ্ড হাত দু'টো তুলে' ধ'রে উদাত্ত কণ্ঠের বন্দনা-গীতিতে নীল আকাশ ও মাতাল বাতাস ধ্বনিত ক'রে তুল্তো। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউগুলো ভক্তের মতো ছুটে' এসে ভাঙা নট্কনার মতো তার রাঙা পায়ের প্রান্ত ঘেঁসে' একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে লুটে' পড়্তো।

একদিন এম্নি ক'রে সন্ন্যাসী যখন সৌন্দর্য্যের বন্দনায় ব্যস্ত, তখন তার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখ্লো তরুণী রাজকন্যা অরুণা।

পূজারী

খেয়ালের রাণী সেদিন মরালের মতো সাঁতারে সাঁতারে ভরা-নদীর নীল জল-ধারাকে ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়ে বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো তনু-লতাখানি নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল—কক্ষে ছিল তার ভরা ঘট—বক্ষ জুড়ে' তার আলিঙ্গনের মতো হ'য়ে জড়িয়ে ছিল ধূসর ধোঁয়াটে একখানি শাড়ী। সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি পড়্তেই জল-ভরা ঘট কাঁখে নিয়ে, ফির্বার কথা ভুলে' গিয়ে, বাতাসের বুকে ফুলের গন্ধটুকুর ন্যায় সেই দৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অর্পণ ক'রে সে আড়ষ্ট অচল হ'য়ে থম্কে দাঁড়ালো। আর এদিকে আলোর আরতি শেষ ক'রে সন্ন্যাসী ফিরে চাইতেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়্লো সেইখানে—যেখানে জমাট যৌবনের মতো রাজকন্যা অরুণার তরুণ তনু-লতাকে বেষ্টন ক'রে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি-রেখা আলিঙ্গনের মতো হ'য়ে নেমে পড়েছে।

সন্ন্যাসী দেখ্লো—কী সে সুন্দর মুখ! বসন্তের নিবিড় স্পর্শের মতো তার সমস্ত হৃদয় একটা পুলক-স্পন্দনে ভ'রে উঠ্লো। উচ্ছল নদীর কল-গাথার ন্যায় একটা আকুল ক্রন্দন তার বক্ষ-তটকে আঘাত ক'রে ফেটে টুটে' পড়্তে লাগ্লো। তার হৃদয় অত্যুগ্র ব্যথায় কাঁদ্তে গিয়ে

সেদিন সাড়া দিল—সে সার্থক—ওগো আজ সে সার্থক !

সন্ন্যাসীর উত্মত সেই দৃষ্টির সম্মুখে সারা গায়ে রাজ্যের লজ্জা জড়িয়ে, ভরা ঘট ছলকিয়ে, নতমুখী তরুণী হাওয়ার মতো লঘু পা ফেলে তেমনি ক'রে ধীরে ধীরে স'রে গেলো, যেমন ক'রে প্রভাতের ফোটা পদ্মটি বাতাসের ঘায়ে আস্তে আস্তে সন্ধ্যাবেলায় জলের তলে নুয়ে' পড়ে।

ওগো তুমি কে গো—তুমি কি ? বসন্তের আনন্দ-মঞ্জরীর মতো তোমার পুষ্পিত তনু-লতা ! বর্ষার পরিপূর্ণ তটিনীর ন্যায় পরিপূর্ণ যৌবনের স্বচ্ছ আভাস তার কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত ! গানের মূর্চ্ছনার মতো তোমার করুণ দৃষ্টি—কবিতার ছন্দের মতো তোমার ললিত গতি ! ওগো চেয়ে দেখো, তারই লীলা প্রতি-পদ-ক্ষেপে এক-একটি ক'রে শতদল পদ্ম ফুটিয়ে আমার বুকের উপর তোমার গতি-বেগের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। কী লঘু তোমার দেহ—কী মদির—কী স্নিগ্ধ তার ভঙ্গিমা !

সন্ন্যাসীর সমস্ত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আর্ত্তনাদের মতো কি একটা ব'য়ে গেলো। সাথে সাথে ঝড়ের মতো ক'রে সমস্ত হৃদয়টাকে ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়ে গেলো। সে কঠিন মাটির উপর শুয়ে' প'ড়ে তার ভগবানকে ডেকে বল্‌লে—ওগো অন্ধকারের আলো, তুর্দ্দিনের বন্ধু, আজ

আমার হৃদয় গুরুভারে অবনত—ভয়ে ভাবনায় বিচলিত। আমার মন বিক্ষিপ্ত—চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত—শরীর অবশ। আমাকে সবল করো প্রভু—সবল করো।

* * * *

পরের দিন ভোরের বাতাসে জেগে সন্ন্যাসী যখন চক্ষু চাইলো, তখন তার হৃদয় একেবারে হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। কি একটা গভীর আনন্দে তার সবটা মন ভরপূর। সাদা মেঘের মতো নীল আকাশের তলে সে যেন উধাও হ'য়ে উড়ে' চলেছে—মাঝে কোনোখানে কোনো বাধা নেই। কেবল অন্তরের ভিতরে—যেখানে তার মূর্ত্তিহীন দেবতার কনক আসনখানি ক্ষুধিত তৃষিত হ'য়ে এতদিন ধ'রে খালি প'ড়ে ছিল, সেইখানে ভেসে উঠেছে এক-খানি অনিন্দ্য-সুন্দর তরুণীমূর্ত্তি।.........

তারপর হ'তে ওপারের ভরা সন্ধ্যা দিনের পর দিন এপারে যখন ঘন হ'য়ে নেমে আস্‌তো, সন্ন্যাসী ঘাটে এসে দাঁড়াতো; আর তরুণী রাজকন্যা সেই ভরা ঘট কাঁখে নিয়ে গমনের পথে তার দিকে আকাশের একটি-মাত্র নক্ষত্রের ন্যায় চেয়ে থাক্‌তো। কেউ কোনো কথা কইতো না। কারো পরিচয় কেউ জান্‌তে চাইতো না।

শুধু তাদের দু'জনের দৃষ্টির ভিতরে ভিতরে কথা চল্‌তো—এর দৃষ্টি ওকে ডেকে বল্‌তো—"আমি তোমায় চিনি—ওগো আমি তোমায় চিনি......জন্ম জন্ম আমাদের এই প্রেম আর-সবাইকে বঞ্চিত ক'রে এমনি ক'রে সঞ্চিত হ'য়ে এসেছে। এই উন্মুখ হৃদয়ের অগাধ প্রেমে আমরা দু'জনা দু'জনাকে অভিষিক্ত ক'রে উজ্জ্বল ক'রে তোল্‌বো। কোনোখানে এতটুকু সঞ্চিত ক'রে রাখ্‌বো না—আমি তোমাকে সব দেবো বন্ধু—সব দেবো।"......

আনন্দের অশ্রুধারার মতো ভরা হৃদয় নিয়ে সন্ন্যাসী ঘরে এসে ভাব্‌তো, অরুণার সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখের কথা। নির্ব্বাক প্রণয়ের মুখর গুঞ্জন তাকে অধীর ক'রে তুল্‌তো। পুলক-চঞ্চল তার দেহের ভিতর মূর্চ্ছার মতো কি একটা আবেশ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তো তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌তো না। বুকের উপর দু'টি হাত তুলে' ধ'রে, চক্ষু দু'টি মুদ্রিত ক'রে সে স্বপ্ন দেখ্‌তো, তার হৃদয়ের মাঝখানে নেমে এসেছে কার দু'টি স্নিগ্ধ বাহুর নিবিড় আলিঙ্গন। কী সে স্পর্শ! ফুলের মতন তার ভিতর হ'তে গন্ধ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—মদের মতো তার ভিতর হ'তে একটা নেশা জমাট বেঁধে বাইরে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

দিনের পর দিন এমনি ক'রে যখন তাদের ভাষাহীন পরিচয় আষাঢ়ের মেঘের মতন গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তখনই সহসা একদিন গ্রামবাসীদের নির্দ্দয় বজ্র তাদের প্রতি উদ্যত হ'য়ে উঠ্‌লো। এই গোপন আঁখির প্রচ্ছন্ন অভি-সারকে তারা সহ্য করতে পারলে না। রাজাকে জানালে তারা—সন্ন্যাসী সাধু-পুরুষের ব্যভিচারীর মতো এই ব্যবহার। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-দরবারে সন্ন্যাসীর তলব পড়্‌লো।

*
* *

রাজবাড়ীর ভিতর পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা রাজার দর্‌বার-খানা। সেইখানে সোনার সিংহাসনে ব'সে সোনার মতো কঠিন-হৃদয় মহারাজ নিদারুণ হৃদয়হীনতার সাথে দণ্ড দিতেন, আর ততোধিক হৃদয়হীনতার সাথে সভাসদ্‌গণ তাকে বরণ ক'রে নিত। রাজসভার করুণ কম্পিত হৃদয় সে ঘোষণায় গভীর ব্যথায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌তো। কেবলমাত্র রাজকন্যা অরুণার মর্জ্জি যেদিন তাকে রেশমের জালে ঢাকা দর্‌বারখানার জানালার ফাঁকে টেনে

আন্‌তো, সেদিন এই পাশবিকতা আর নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠ্‌তে সাহস পেতো না।—বসন্তের পল্লব-শ্রীর মতো কোমল একটা আভা সেদিন রাজসভাকে মায়ের মমতার মতো করুণ স্নেহে একেবারে ভরপূর ক'রে রাখ্‌তো। কিন্তু কিছু দিন হ'তে দর্‌বারের জালায়নে রাজকন্যার মণিকাটা সিংহাসনের দিকে চাইলেই দেখা যেতো—সিংহাসনটা খালি প'ড়ে রয়েছে। তার মণির দীপ্তিকেও নিজের আগুনের মতো দীপ্তি দিয়ে যে উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌তো, সে রাজকন্যার সন্ধান সেখানে এখন বড় একটা মিলতো না। সকলে মনে কর্‌তো, বুঝি রূঢ়তার ছোঁয়াচ ফুলের মতো কোমল স্থানটাকেও স্পর্শ ক'রে দিনে দিনে পলে পলে কঠোর ক'রে তুলেছে—অহল্যার ন্যায় রাজকন্যার শিশিরের মতো কোমল দেহটাও বুঝি তার রুদ্র অভিশাপে ধীরে ধীরে পাষাণে পরিণত হ'য়ে গেছে।

এমনি যে রাজ-দর্‌বার, সেইখানে সহসা একদিন এসে দাঁড়ালো সেই সগর্ব্ব-স্বাধীন তরুণ-কান্ত সন্ন্যাসী। ....

এ কে—এ কে গো? এ তরুণ তাপস যে হাসির মতো সুন্দর—শিশুর মতো সরল। এর আবার অপরাধ কি!

ভীত সকলের বুকের ভিতর কেঁপে উঠ্‌লো। নিঃশ্বাসের বাতাস দেয়ালে বেধে কেঁদে গাইলো—হায়-হায়-হায়রে

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়্‌লো—জরীর জাল দিয়ে ঢাকা সিংহাসনের পিছনে। সেখানে মণির ঝালরে ঘেরা রেশমের ওড়্‌নাতে অনেক দিন পরে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-রাগ-বৈচিত্র্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে কি না, তাই দেখ্‌বার জন্য সকলের নয়ন একসঙ্গে চল-চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সন্ন্যাসীর নবারুণের মতো সেই মুখখানির দিকে বিস্মিতের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহসা আপনাকে সচেতন ক'রে তুলে' রাজা বল্‌লেন—সন্ন্যাসী, তোমার ব্রত ইন্দ্রিয়-সংযম—লালসার নিবৃত্তি। তুমি এ কি করেছ! আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবো।

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিল—মহারাজ, আপনি ভুল করেছেন। আমি সৌন্দর্য্যের পুরোহিত। আমি তারই পূজা করেছি—অন্যায় কিছু করি নি।

রাজা তাঁর স্বাভাবিক কঠোর কণ্ঠস্বরকে আরো কঠোর ক'রে বল্‌লেন—তুমি তন্ময় হ'য়ে যুবতীর পানে চেয়ে থাকৃতে, সে সাক্ষীর অভাব হ'বে না।

কথার ভিতরে আপনাকে অর্পণ ক'রে দিয়ে সন্ন্যাসী বল্‌লো—মহারাজ, সে যুবতী যে রূপের দীপালী—সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। আমি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে দেবতার

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পায়ে আপনাকে নিবেদন করেছি মাত্র—আর কিছু তো করিনি।

ক্রোধ-কম্পিতস্বরে রাজা বল্‌লেন—পণ্ড-ব্রত সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্ত……

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হ'বার আগেই অন্তঃপুরের দুয়ার খুলে' সিংহাসনের তলে এসে দাঁড়ালো শরতের আকাশের রঙের মতো নীল ঘোম্‌টার মেঘে ঢাকা রাজকন্যা অরুণার দাসী। তার জ্যোৎস্নার মতো সুন্দর হাতে সোনার থালার উপর প'ড়ে রয়েছে ভূর্জ্জপাতে লেখা রাজার নামের চিঠিখানি।

এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে রাজকন্যার চিঠি দাম্ভিকতার রক্ত-লোলুপ অগ্নি-জিহ্বার উপর আরো কতবার যে মেঘ-মেদুর আকাশের অবিরল জল-ধারার স্নিগ্ধ প্রলেপ টেনে দিয়েছে—সে কথাটা মনে পড়্‌তেই রাজসভার এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজকন্যার জয়ধ্বনি মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। রাজা রুদ্র রোষ দমন ক'রে হেসে বল্‌লেন—সন্ন্যাসী, তুমি ভাগ্যবান। রাজ-কুমারী তোমার বিচার-ভার গ্রহণ করেছেন।

*　　*　　*　　*

সেদিন অজস্র কালো কেশের মতো অন্ধকারের

নাগপাশ সমস্ত আকাশ বাতাস ঢেকে ফেলে' আপনার বীভৎসতায় ভীত হ'য়ে আপনিই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিল। ঝঞ্ঝার ঝাপ্‌টা ক্ষ্যাপা দৈত্যের মতো পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু ক'রে ফুৎকারে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে ফুলে' ফুলে' গর্জ্জাচ্ছিল এবং ভারি ভারি মেঘগুলো বাঁকা বিদ্যুতের তরবারের আঘাতে দিক্‌ হ'তে দিগন্ত পর্য্যন্ত চিরে' দিয়ে কি একটা নিবিড় বেদনায় গভীর হাহাকারের মতো হ'য়ে একেবারে ধরিত্রীর বুকের উপর ফেটে ভেঙে পড়্‌ছিল।

রাজকন্যা অরুণা প্রকৃতির প্রলয়ের মতো সেই নিমন্ত্রণকে সার্থক ক'রে বজ্র-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়ালো বাহিরের অন্ধকারের মতো নিবিড় কালো কারাগারের ভিতর। তার কঠিন পাষাণ-স্তূপের উপর একমুঠো ঝ'রে-পড়া শেফালিগুচ্ছের মতো যে জায়গায় প'ড়ে ছিল ধ্যান-মৌন অপূর্ব্ব-সুন্দর সেই সন্ন্যাসী, সেইখানটায় এসে তার লীলার মতো ললিত পদ-ক্ষেপ একেবারে স্থির নিশ্চল হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারপর কোনো ইতস্তত না ক'রেই একটি ফুলের উপর আর-একটি ফুল নুয়ে' পড়্‌লো।

রাজকন্যা আবিষ্টের মতো সন্ন্যাসীর বাহু-মূল স্পর্শ ক'রে বল্‌লে—চেয়ে দেখো সন্ন্যাসী, তোমার দুয়ারে আজ কে

নেমে এসেছে।—তোমার মৃত্যু-ভয়াতুর দুঃখের রাত্রি আনন্দের সূর্য্য-কর-লেখায় উদ্ভাসিত ক'রে চেয়ে দেখো—হে চিরসুন্দর, হে চিরসুহৃদ্, কে আজ নেমে এলো গো—কে আজ নেমে এলো!

এ কী কণ্ঠস্বর—এ কী স্পর্শ! সন্ন্যাসীর রেশমের মতো পক্ষ্মদলের ভিতর প্রভাতের অরুণ-লেখার মতো আনন্দের একটা স্পন্দন জেগে উঠ্‌লো—নীলপদ্মের মতো তার বিস্ফারিত চোখ্ দু'টির, মুগ্ধ দৃষ্টি সে নিক্ষেপ কর্‌লে প্রজাপতির মতো বিচিত্র-বেশ-বিলসিতা রাজকন্যার মুখের উপরে।

কিন্তু এ কে গো—এ কে? কোথায় তার সেই নিরাভরণা সদ্য-স্নাতা জল-কলস-ভার-মন্থরা প্রেয়সী, যে বসন্তের অসজ্জিত গৌরব-শ্রীর মতো সুন্দর, লজ্জার রক্ত-রাগ-মধুর গণ্ডের মতো অপূর্ব্ব—সে কোথায় গো—সে কোথায়?

মণি-মুক্তা-ভুষিতা ফিরোজা রঙের ওড়্‌নার আড়ালে খড়্গের মতো উদ্দৃপ্ত রাজকুমারীর মুখের উপর জ্বলন্ত চোখ্ দু'টো স্থাপন ক'রে সন্ন্যাসী আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—তুমি কে—তুমি কে গো! আমি তো তোমাকে চাইনি।.........

—ভুল ক'রো না বন্ধু, ভুল ক'রো না—আমি রাজকন্যা অরুণা। এই কঠিন পাষাণ, এ তো তোমার যোগ্য উপাধান নয় প্রিয়তম। জাগো বন্ধু—চেয়ে দেখো।

সঙ্গে-সঙ্গেই ফুলের মালার মতো তার গলায় জড়িয়ে গেলো, রাজকুমারীর তরুণ কোমল বাহুলতা—আর বৃষ্টির মতো তাকে আচ্ছন্ন ক'রে নেমে এলো দু'টি তপ্ত লোলুপ ক্ষুধিত অধরোষ্ঠের অজস্র চুম্বনধারা।

মুহূর্ত্তের জন্য সন্ন্যাসীর দেহখানিও অবশ হ'য়ে এলিয়ে পড়্‌লো—তারপর বাণাহত কুরঙ্গের মতো একেবারে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সজোরে দুই হাতে সেই কিশলয়ের মতো কোমল দেহখানি সরিয়ে দিয়ে সে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—রাজকুমারী, তোমার আলিঙ্গন কামের বীভৎসতায় ভরা। ঘৃণার বিষে তা' আমার সারা দেহ বিষিয়ে তুল্‌ছে। তোমার ছোঁয়ায় আমার অন্তর-দেবতার দীপ্তি ম্লান হ'য়ে উঠেছে। এ স্পর্শ তুমি সরিয়ে নিয়ে যাও। তোমার এ আলিঙ্গনের চাইতে মৃত্যুর আলিঙ্গন অনেক স্নিগ্ধ, অনেক মধুর!

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাতা রাজকুমারী অপমানে গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—তাই হোক্। রমণীর প্রেমের সঙ্গে যে এমন ক'রে প্রতারণা করতে পারে, জমাট তুষারের

মতো হিম তুহিন মৃত্যুই তার যথার্থ পুরস্কার, ঘাতকের খড়্গের আলিঙ্গনই তার যোগ্য আশ্রয়। রাজকুমারী অরুণা এই প্রথম এই শেষবার ভণ্ড দাম্ভিক সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চরম দণ্ডাজ্ঞা প্রচার কর্ছেন—ব'লেই সে স্খলিত উল্কার মতো কক্ষের ভিতর প্রলয়ের দীপ্তি হেনে ঝড়ের মতো ক'রে বেরিয়ে গেলো।

সন্ন্যাসী সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে রূঢ় পাষাণের বুকের উপর আপনাকে অর্পণ ক'রে কেঁদে গাইলো—ওগো আমার সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব প্রতিমা—তুমি কোথায় গো—তুমি কোথায়!

* *

*
* *

সেদিন ভোরের বাতাস ফুলের গন্ধের উপর ঢ'লে পড়্‌বার আগেই পিশাচখানার মতো রাজার কোতল-খানার চারিদিকে সাগর-কল্লোলের মতো জন-সমুদ্রের কল-কোলাহল জেগে উঠেছে। রাজকুমারী অরুণার মোমের মতো করুণ হৃদয় যাকে বাঁচ্‌বার আদেশ দিতে পার্‌লো না, তাকেই দেখ্‌বার জন্য সহর ভেঙে বন্যার স্রোতের মতো জন-স্রোত ছুটে চলেছে। কিন্তু আজ আর তাদের মুখে রাজকন্যার জয়ধ্বনি মেঘের দীর্ঘায়ত গুরু-

গর্জ্জনের মতো আকাশ ভ'রে বাতাস আলোড়িত ক'রে তুল্‌ছে না। লক্ষ লোকের চোখের দৃষ্টি ভ'রে রেখেছে আজ দ্বিধার মতো একটা গভীর বিস্ময়।

পূবের দিক্ রাঙা ক'রে একখণ্ড জ্বলন্ত আগুনের মতো নবারুণের রক্ত আঁখি ভোরের আকাশে যেমন জেগে উঠ্‌লো, মৃত্যুর মাচার উপর দিক্ আলো ক'রে এসে দাঁড়ালো প্রশান্ত নির্ভীক্ সেই সন্ন্যাসী। তার কালো চোখে একখানি দৃষ্টি বড় ব্যগ্র—বড় করুণ। সেই এক-খানি দৃষ্টির ভিতরে বড় এক ফোঁটা অশ্রুর মতো সবটা হৃদয় ফুটিয়ে তুলে' সে আজ চারিদিকে তার সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে খুঁজে' বেড়াচ্ছে। সে যে আজ নিঃশেষে নিজেকে বোঝাতে চায়, হৃদয়ের নীরব প্রেমকে পরিস্ফুট ক'রে নিবেদন কর্‌তে চায়, বাইরের বাধা লোক-লজ্জা সব মুছে' ফেলে আপনাকে দেখাতে চায়—সে কোথায় গো —সে কোথায়!

সহসা সমস্ত জায়গা ঘুরে' সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সেইখানে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো, যেখানে—দূরে—সিংহাসনের গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে মূর্ত্ত শোকের মতো তরুণী রাজকুমারী অরুণা। আজ আর তার দেহ বেষ্টন ক'রে হীরকের সূচী-মুখ অলঙ্কারগুলো হাসির দীপ্তির মতো ঝক্‌মক্ কর্‌ছে

না—রূপের জ্যোতি বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে তার সোনার মতো গা'খানি বেড়ে' প'ড়ে আছে অতি সাধারণ ধূসর ধোঁয়াটে সেই শাড়ীখানি—সন্ধ্যার অভিসারে যেখানি তার প্রতিদিনের সঙ্গী ছিল। তার বুকের ভিতর রক্তের স্রোত বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বেঁধে গেছে। তার হৃদয়ময় আঘাত ক'রে ফির্‌ছে কেবল একটি মাত্র ধ্বনি—তোমায় আমি এ কী দিলাম বন্ধু—এ কী দিলাম!

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি রাজকুমারীর মুখের উপর প'ড়েই একটা নিবিড় চুম্বনের রেখার মতো হ'য়ে হেসে উঠ্‌লো। তার সবটা হৃদয় যেন ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—ওগো আমার প্রতি-প্রভাতের ধ্যানের দেবতা, প্রতি-সন্ধ্যার জল-ভার-নতা তরুণী, প্রতি-রাত্রের স্বপ্নের প্রতিমা, তুমিই তবে রাজকুমারী অরুণা! কাল তোমাকে চিন্‌তে পারিনি সখী, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করো গো—মার্জ্জনা করো। কিন্তু তোমার চোখের ভিতর অশ্রুবিহীন কান্নার মতো ওকি বেদনা আজ ফুটিয়ে তুলেছ? আজ তো তোমার কান্নার দিন নয় প্রিয়তমে! যে প্রেম মানুষকে মাটির সাথে নুইয়ে ফেলে, আমি তো তাকে চাইনি। তাইতো তুমি একহাতে জীবন আর একহাতে

পূজারী

মৃত্যু নিয়ে ফুলের মতো নু'য়ে প'ড়ে বজ্রের মতো কঠিন হ'য়ে আমার চোখে জেগে উঠেছে!

বিদ্যুতের তরবারে আকাশকে দীর্ণ ক'রে বজ্র যেমন হ'য়ে ধরণীর বুকের উপর ফেটে টুটে' ভেঙে পড়ে, তেম্‌নি ক'রে সন্ন্যাসীর বুকের উপর ফেটে প'ড়ে রাজকন্যার সেই একটি কথা আবার হাজার স্বরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো—আমি তোমাকে এ কী দিলাম বন্ধু—এ কী দিলাম!

ধনুকের মতো সুন্দর চোখ্ হ'তে তীরের মতো হাসি-রাশি ছুড়ে' দিয়ে সন্ন্যাসী বল্‌লে—ছিঃ! ছিঃ! দুঃখ ক'রো না রাজকুমারী, তোমার ন্যায়-বিচার ভণ্ড পূজারীর প্রতি যথার্থ দণ্ডই বিধান করেছে। যে নিজের খেয়ালে মগ্ন থেকে প্রাণের দেবতাকে চিন্‌তে পারে না—মৃত্যুই তো তার যোগ্য পুরস্কার। পূজার ফুল যে আনন্দ নিয়ে দেবতার পায়ে ঝ'রে পড়ে, সেই আনন্দে আমার হৃদয় আজ পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। তোমার ঐ অশ্রুজলের ঝর্‌ণায় আমার এই অপূর্ব্ব সার্থকতা এই বিজয়-গৌরবকে ভাসিয়ে দিয়ো না গো—ভাসিয়ে দিয়ো না।

মুখের ভাষার মতো ক'রে সন্ন্যাসীর প্রাণের কথা-গুলি ঢেউয়ের মতো ধীরে ধীরে লুটে' পড়্‌লো অরুণার দলিত আঙ্গুরের মতো মথিত বুকের উপর। মর্ম্মটাকে

ভেঙে চূরে' রেণু রেণু ক'রে দিয়ে এবার তার হৃদয় গেয়ে উঠ্‌লো—কোথায় যাবে বন্ধু, কোথায় যাবে!—আমার এই উন্মুখ প্রেম পরিত্যাগ ক'রে তুমি কোথায় যাবে! কেন এই রাক্ষসীর চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলে প্রিয়তম?—প্রেমের এমন প্রতিদান কেউ কি কখনো দিয়েছে? কাল যদি এমনি ক'রে একবার ডাক্‌তে বন্ধু—কাল যদি চিন্‌তে......... .. ..

কিন্তু তার প্রাণের কথা চোখের ভাষায় শেষ হ'য়ে ফুটে' ওঠ্‌বার আগেই ঘাতকের খড়্গ সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ ক'রে উঠে' বিদ্যুতের মতো নেমে এলো—ফুলের অর্ঘ্যের মতো সুন্দর সেই সন্ন্যাসীর মাথার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর সংজ্ঞাহীন দেহ বোঁটা-খসা শেফালিটির মতো সিংহাসনের গোড়ায় লুটিয়ে পড়্‌লো। উন্মত্তের মতো পায়ের আঘাতে সিংহাসন ছুড়ে' ফেলে বেপমান বাহুপুটে রাজা যখন তার তনু-লতাখানিকে বুকের উপর তুলে' ধর্‌লেন, তখন সে শরীর হিম—জড়—অসাড় হ'য়ে গেছে।

পুরীর ডায়েরি

পুরীর ডায়েরি
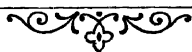
পূজার ছুটির ভিতর যে-জ্বরটা একান্ত আকস্মিকভাবেই দেহটাকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছিল, পূজার ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও তার জের যখন মিট্‌লো না, তখন ডাক্তারেরা উপদেশ দিলেন পুরীটা ঘুরে' আস্‌বার জন্যে। সুতরাং পৌট্‌লা-পুঁট্‌লী বেঁধে এক রাত্রে হঠাৎ বেরিয়ে পড়্‌লুম পুরীর পথে। বাড়ী আগে থাকৃতেই ঠিক হ'য়ে ছিল বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণে। বাক্স-প্যাঁট্‌রা এবং বাক্স-প্যাঁট্‌রারই সামিল একটি মেয়ের দঙ্গল নিয়ে বাড়ীর চৌকাটটায় পা দিতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম—বাড়ীটাতে যারা

বাস কর্‌তো তা'রা সত্ত-সত্ত চ'লে গেছে। যাবার জন্যে যে তা'রা প্রস্তুত ছিল না, তারও পরিচয় পেলুম, ঘরে ঢুকে'ই ঘরগুলোর অবস্থা দেখে'। অনেকগুলো দর্‌কারী জিনিষ যা ধীরে-সুস্থে গেলে গুছিয়ে নেওয়া চল্‌তো, তা গুছিয়ে নেওয়া হয়নি। একটা তাকের ওপর কতকগুলো বই ছড়ানো প'ড়ে রয়েছে, আর-একটা ঘরের কোণে একটা কাঠের বাক্সের ভিতর ভাগে-ভাগে অনেকগুলো ডা'ল-চা'ল-মশ্‌লা সাজানো। চমৎকার একটা জলের কুঁজো সেই ঘরেরই আর-একটা কোণে দিব্য আরামে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার তাকে তিন চারটা 'টি-কাপ', একটা ছোট 'ট্রে'—এগুলোও নেওয়া হয়নি।

পুরী ক্ষয়-রোগীদের ডিপো বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ রকমের একটা পরিত্যক্ত বাড়ী দেখে' রীতিমত ভয় পেয়ে বন্ধু নীরেনকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম—বাড়ীটে 'হোয়াইট্‌-ওয়াশ্‌' করা হয়নি দেখ্‌ছি ; কোনো ছোঁয়াচে রোগের রোগী-টোগী ছিল না তো ?

বন্ধু হেসে বল্‌লেন—আরে না না, এ বাড়ীতে ছিল একটি মেয়ে ; আর কয়েকদিন পরে তার পেছনে এসে জুটেছিল একটি যুবক। মেয়েটিকে যদি তুই দেখ্‌তিস্‌—একেবারে তরল চপল বিদ্যুৎপুঞ্জ !

পুরীর ডায়েরি

আমি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বল্লুম—ভাগ্য-দেবতা দেখ্ছি চিরকাল আমার দিকে তাঁর ভুরু কুঁচ্‌কেই ব'সে আছেন। তাও বলি, এক হিসেবে এ এক রকম মন্দ হয়নি; দেহের জ্বরে তবু টিঁকে' আছি, এর পর মনের জ্বর-সুরু হ'লে আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পার্‌তুম না। তারপর জানিস্ ত ভাই, তোর বৌদিদিকে! বিদ্যুৎ দূরের কথা, ঘেঁটু ফুলের কাছেও আমাকে তিনি ঘেঁস্‌তে দিতে নারাজ। তাঁর বিশ্বাস আমার নাকি সে বয়সটা এখনও উৎরে যায় নি, যখন মানুষ বিদ্যুৎ দেখ্‌তে গিয়ে বিদ্যুতের বাজের বাণটাই বুকে নিয়ে ফিরে আসে।

নীরেন উচ্চ হাস্যে বাড়ীটাকে মুখরিত ক'রে তার বৌদি'র সন্ধানে উঠে' পড়্‌লো। তা'কে বিদেয় দিয়ে যে ঘরটাকে শোবার ঘর কর্‌বো ব'লে মনে করেছিলুম সেই ঘরটাতে প্রবেশ কর্‌লুম। ঘরটার এক পাশে কতকগুলো কাগজ ছড়ানো পড়ে' রয়েছে। হঠাৎ নীরেনের সেই মেয়েটির কথা মনে প'ড়ে কাগজগুলো হাত্‌ড়াতে ব'সে গেলুম।

দু'চারখানার উপর চোখ্ বুলিয়ে সব ঝেঁটিয়ে ফেল্‌বার ব্যবস্থা কর্‌বো মনে কর্‌ছি, হঠাৎ চোখ্ পড়ে' গেলো একখানা সৌখীন-ধরণের বাঁধানো খাতার উপরে।

তার মলাটের উপর মেয়েলী-হাতের পরিস্কার ছাঁদে লেখা—'পুরীর ডায়েরি'।

লেখাগুলো মারীচ দানবের ছদ্ম-রূপের মতো আমার মনকে আকর্ষণ করতে লাগলো। জিনিষ-পত্র গোছাবার ভার আর সকলের হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্যান্‌ভাসের ইজি চেয়ারখানা সমুদ্রের ধারের দিকের বারান্দায় বিছিয়ে নিয়ে আমি পড়্‌তে স্বরু ক'রে দিলুম :—

***

*
* *

১২ই আশ্বিন—১৩২৮

হঠাৎ কেন খেয়াল হয়েছিল পুরীতে আস্‌তে, জানিনে। খেয়াল যখন হ'লো, বেরিয়ে পড়্‌লুম বৃহস্পতিবারের বার-বেলায়, সেই সমুদ্রের উদ্দেশে, যার রূপের কখনো অন্ত পাইনি, বহুরূপীর মতো যার চেহারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লায়। ভোরের আলো আকাশের গায় ফুটে' ওঠ্‌বার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরীর তোরণ-তলে বাষ্পের রথ এসে থাম্‌লো। পাণ্ডাদের হাত এড়িয়ে যেমন সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালুম, সমুদ্রের

দিকে তাকিয়ে সারা রজনীর জাগরণ-ক্লান্ত নয়ন একেবারে জুড়িয়ে গেলো! মেঘের ভিতর দিয়ে রৌদ্রের ছায়া এসে পড়েছে, আধখানি সমুদ্রের বুকের উপরে হাসি-কান্নার অপূর্ব্ব আলেখ্যের মতো। চোখ্ ভ'রে গেলো, সমুদ্রের দোলার সঙ্গে তাল দিয়ে মন দুলে' উঠ্লো। সমুদ্রের রূপ আমায় টান্ছে, তার দোলানি আমার মনকে দোলাচ্ছে, তার মায়া আমার দেহ-মনে ইন্দ্রজাল রচনা কর্ছে।

আধ-ভেজা বালির উপরে পা ছড়িয়ে ব'সে পড়্লুম। একটা ঢেউ ছুটে' এসে ফেনার ফুল দিয়ে আমার পায়ের প্রান্ত স্পর্শ ক'রে অভ্যর্থনা ক'রে গেলো। তীরে বালু-বেলার উপরে লোকজনের আনাগোনার ভিড় বেশ বেড়ে উঠেছে—ঠিক কল্কাতার পথের ভিড়ের মতন। কিন্তু কল্কাতার পথের ভিড়ের সঙ্গে এ ভিড়ের তফাৎও ঢের। সেখানে বাইরে মুখ বা'র কর্লেই হাজার ক্ষুধার্ত্ত চক্ষুর ক্ষুধা যেন মুখের উপর প'ড়ে হাহাকার কর্তে থাকে। এখানেও লোকে মুখের দিকে তাকায় বটে, কিন্তু সে তাকানো দূর-পথ-যাত্রীর পথের মাঝে হঠাৎ সঙ্গী মিলে যাওয়ার মতো আনন্দ এবং সহানুভূতির আলোকে ভরা—তার ভিতর ক্ষুধা আছে বটে, কিন্তু অতৃপ্তির হাহাকার নেই।

পুরীর ডায়েরি

বেশ লাগ্‌ছে! কালো ঢেউয়ের ফণার উপরে সূর্য্যের আলো সাপের মাথার মণির মতন জ্বল্‌ছে। আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য এই সমুদ্রের! এই ফেন-হাস্যে মুখর হ'য়ে ওঠে, এই ক্রন্দনের বিক্ষোভে আবার বেলা-তটের উপর ভয়ার্ত্ত শিশুর মতন আছ্‌ড়ে পড়ে। মেঘের মায়াজালের ভিতর এক মুহূর্ত্তে সে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, আবার পর-মুহূর্ত্তেই রৌদ্র-দীপ্ত আকাশের দিকে হাজার বাহু মেলে' ইন্দ্রধনুর রচনা ক'রে যায়। দেহ তার নীলার মতন নীল এবং হাসি তার ইস্পাতের ছুরির মতন সাদা!

*
* *

*
* *

১৫ই আশ্বিন—১৩২৮

বিকেল পাঁচটায় ডায়েরির পাতায় আজ সকালের ছবিটি ধ'রে রাখ্‌ছি।......

বাতাস মাতাল হ'য়ে উঠেছে। আর তারি মাত্‌লামির আমেজ এসে লেগেছে সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র টল্‌ছে—হেল্‌ছে—দুল্‌ছে! ঢেউগুলো তার আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে, আধখানি সাগরের জলরাশিকে টেনে নিয়ে, বেলা-তটের বুকের উপরে। সমুদ্রের ডাক আমার মনের কানে

এসে পৌঁছালো। সে ডাক প্রলয়ের কল্লোলের মতন গাম্ভীর্য্যে ভরা, অথচ তার ভিতর হ'তে আহ্বানের বাঁশীও বেজে উঠ্‌ছে। ধ্বংসের রুদ্র-দেবতার মতন রূপ তার আজ অপূর্ব্ব। এ-রূপ সকলের চোখে পড়ে না—কিন্তু যার চোখে পড়ে, সে চোখ্‌ ফেরাতেও পারে না।

তীরে স্নানার্থীর ভিড় নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সাগরের এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে' রুদ্র-দেবতার দু'চারিটি বেপরোয়া ভক্ত ছাড়া আর কেউ সমুদ্রের কোলের কাছে ভেড়েনি—ভিড়্‌তে সাহস পায়নি। কিন্তু আমার কানে যে সমুদ্রের আহ্বান এসে পৌঁছেছে—আমি ফির্‌তে পার্‌লুম না, সমুদ্রের হাজার বাহুর আলিঙ্গনের ভিতর আপনাকে এলিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে চল্‌লুম!

ঢেউয়ের পথে-পথে মেঘের দামামা বাজ্‌ছে। ঐ সে অজগরের মতন গড়াতে-গড়াতে এগিয়ে আস্‌ছে;—মাথার উপর দিয়ে একটা চ'লে গেলো, লাফিয়ে উঠে' আর একটাকে এড়িয়ে গেলুম। একবার একটা অসাবধান মুহূর্ত্তে মাটির সঙ্গে পা বাধাতে না পেরে একটা তীর-গামী ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যেতেই একজন লোকের সঙ্গে হাত দু'টো লতার মতো জড়িয়ে গেলো। ঢেউটা স'রে যেতেই দেখ্‌লুম, একটি তরুণ মানবের সঙ্গে স্রস্ত-বাস দেহখানা

আলিঙ্গনের মতো হ'য়েই জড়িয়ে আছে। একান্ত অসহায় আমাকে তাঁর সবল বাহু-বন্ধের বেষ্টন হ'তে মুক্তি দিয়ে যুবক বল্লেন—"সমুদ্র আজ ভারী ক্ষেপে উঠেছে, সাবধান!"

একটু কুণ্ঠা-মিশ্রিত অবজ্ঞার হাস্থে তাঁকে পুরস্কৃত ক'রে প্রকাণ্ড একটা ঢেউকে গ্রহণ করবার জন্যে আবার রুখে' দাঁড়ালুম। সমুদ্রের দুঃসহ আনন্দ-অত্যাচার, তার নিষ্ঠুর স্নেহের উন্মাদনা আমার সারা দেহে নির্দ্দয় আঘাত ক'রে গেলো। তার আলিঙ্গনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার দুর্ব্বল দেহ কখনো সাম্‌নে কখনো পিছনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন দুলতে লাগ্‌লো। লোণা জলের ঝাপ্‌টায় চোখ্ দু'টো দারুণ ব্যথায় বিষিয়ে উঠ্‌লো। সমস্ত শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে একটা ক্লান্তির অবসাদ অনুভব করতে লাগ্‌লুম। তবু সমুদ্রের বুকের মায়া আমাকে সাপের মতো ক'রেই জড়িয়ে ধ'রে রইলো। মরুপথে যারা চলে, তাদের চোখের সম্মুখে মরীচিকা যে ছায়া-শীতল উদ্যানের রচনা করে, তার অস্তিত্ব নেই জেনেও যেমন পিপাসাতুর মরু-যাত্রী তার পথ হ'তে আপনাকে ফেরাতে পারে না, ক্লান্তি তাদের যত বেড়ে যায়, গতি তাদের ততই দ্রুততর হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেম্‌নি ক'রে সমুদ্রের

মায়া আমার ভিতর একটা মরীচিকার সৃষ্টি ক'রে বস্‌লো।

সে মরীচিকার মোহ কাটিয়ে ফিরে' আস্‌বার আগেই একটা ফিরে-চলা ঢেউ আমাকে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী ক'রে বুকের ভিতর জড়িয়ে নিলে। ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ ক্ষুধার্ত্ত দরিয়ার মুখের অবগুণ্ঠন হঠাৎ খ'সে পড়্‌লো। তীরের দিকে তাকিয়ে শঙ্কা-বিহ্বল-কণ্ঠে আমি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম।

সমুদ্রের মায়া তখন টুটে' গেছে, ঘন নীল নিতল জলের অন্ধকার আমার চোখের সাম্‌নে একটা বিশ্রী কালো যবনিকা মেলে' ধরেছে মৃত্যুর ছায়ার মতন, ঢেউ-গুলো সাপের মতন বেঁকে-বেঁকে চলেছে ফণা তুলে' তুলে'। সেই বীভৎস, বিবর্ণ সমুদ্রের চেহারার পানে চেয়ে-চেয়ে আমার চোখের সাম্‌নের আলো নিবে' যাচ্ছে।.........

হঠাৎ বুকের উপর কার দু'টি বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ পেলুম। তাকিয়ে দেখি সেই তরুণ যুবক। ক্রুদ্ধ কঠিন মুখখানা তার আমার বুকের কাছে ঝুঁকে' পড়েছে, দৃষ্টির ভিতর তার কঠোর তিরস্কার পুঞ্জীভূত। বিরক্তিতে তার মুখ ভারী হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তবু সে প্রাণপণে

লড়্‌ছে সমুদ্রের সঙ্গে। সমুদ্রের প্রহার যত কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ছে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে, তার স্পর্শের দৃঢ়তা ততই নিবিড় ক'রে অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম।

জীবন-মরণের এ দ্বন্দ্ব মন্দ লাগ্‌ছে না। অপরিচিত বন্ধুর স্পর্শ এসে লাগ্‌ছে দেহের সঙ্গে, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার দেহের রক্ত-কণাগুলিকে দোলা দিচ্ছে। সৃষ্টির আদিম প্রভাতের উর্ব্বশীর মতো দেহের আবরণ টুটে' গেছে। লজ্জা নেই, ভয় নেই! অজানা পথ-যাত্রায় সঙ্গী—মৃত্যু-বাসরের অপরিচিত প্রিয়তম! মনে হচ্ছে, মরণের আগের মুহূর্ত্তে এ-স্পর্শকে সাথী ক'রে বেশ চ'লে যাওয়া যায়—মৃত্যুর যে-পথটায় একা পা বাড়ানো যায় না, দু'জনে মিলে' সে-পথে পাড়ি দেওয়া মোটেই কঠিন নয়!

আমার দেহ তার বাহুর তলে একেবারে এলিয়ে দিলুম।......

* * * *

আমাকে নিয়ে সে যখন ফিরে এলো, তখন তার অবসন্ন দেহ একেবারে এলিয়ে পড়েছে। হাপরের হাওয়ার মতন বুকের ভেতর প্রাণটা যে তার দুপ্‌-দাপ্‌ কর্‌ছে,

বাইরে থেকে তার শব্দ শুনে' আমার চিত্ততল বেদনায় ব্যথিয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু তার বরফের মতন ঠাণ্ডা চাউনির দিকে তাকিয়ে মমতা দেখানো দূরে থাক্‌, একটা কৃতজ্ঞতার কথাও ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লুম না। কেবল তাকে ব'লে এলুম—সমুদ্রের কোল ঘেঁসে ঐ যে লাল রঙের বাড়ীটা আকাশের পানে মাথা তুলেছে—ঐটেই আমাদের.........

কিন্তু কথাটা শেষ কর্‌তে পার্‌লুম না—আমারও শরীর এলিয়ে আস্‌ছে!

* * *

* *

১৬ই আশ্বিন—১৩২৮

ভোরের বেড়ানো শেষ করে' চিঠি নিতে পোষ্ট-আফিসে এসে দাঁড়িয়েছি। মেম-সাহেব পোষ্ট-মাষ্টার আমার নামের চিঠিখানি হাতে দিয়ে একটু মৃদু হাস্‌লেন। দু'দিন আগে এই পোষ্ট-মাষ্টারণীর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়ে গেছে। চিঠিখানি নিয়ে উঠে' যাচ্ছি, তিনি কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বল্‌লেন—You should have thanked me.

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে পড়্‌লুম। চিঠিখানার চেহারায় এবং তার ভিতরকার গন্ধে একটু বাহুল্য ছিল। মেম-সাহেব হয় তো মনে করেছেন, চিঠিখানা আমার প্রিয়তমের চিঠি।

বাইরে এসে খুলে' দেখি—এ চিঠি প্রিয়তমেরই বটে! চিঠি লিখেছে পরেশ—একেবারে প্রেমের নিবেদনের স্তুতি-গানে ভরা। সে লিখেছে—আমার পায়ের তলে তার মুগ্ধ হৃদয়টি সে একান্তভাবেই উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে। তার হৃদয়-শতদল বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, সূর্য্যের মতন আমারি মুখের পানে চেয়ে। আমি যদি গ্রহণ না করি, তার অমূল্য জীবন একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আমি কবে ফির্‌ব ? আমারি পথের পানে তার সমস্ত হৃদয় প'ড়ে রয়েছে একটা দৃষ্টির মতন হ'য়ে—ইত্যাদি—ইত্যাদি.........

এম্‌নি-ধরণের চিঠি এ-জীবনে আরো কত পেয়েছি—হয়তো আরো অনেক পেতে হ'বে। পুরুষের এই ক্যাঙলা-পনা—এ আমার মোটেই ভালো লাগে না। পুরুষের যা' বৈশিষ্ট্য, এদের সেই জিনিষটারই অভাব র'য়ে গেছে—এদের মনের দৃঢ়তা নেই। এরা প্রথম যে-নারীকে চোখ্‌ মেলে দেখে, তারি সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে যায়। তার

পর দু'দিন পেরুতে না পেরুতেই মোহ যখন টুটে' যায়, তখন এই মাথার মণিই হ'য়ে ওঠে, বুকের ভারী বোঝার মতন। আমার চোখের সাম্‌নে এদের লালসার মদ রক্তের মতন রাঙা হ'য়ে অনেকবার পান-পাত্র পূর্ণ ক'রে উপ্‌চে পড়েছে। অনেকবার তা ঠোঁটের কাছেও তুলে' ধরেছি, কিন্তু অধর গলিয়ে তা ভিতরে গ্রহণ কর্‌তে পারিনি।

এত বড়-বড় পুরুষগুলো নারীর রূপের সাম্‌নে কেন যে ডিনামাইটে ধ্বসে-পড়া পাহাড়ের মতন গুঁড়িয়ে যায়, আমার কাছে তা ভারি আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়!

পরেশকে নিয়ে খেলাটা হয়ত একটু বেশী হ'য়ে পড়্‌ছে—আর নয়। যে পতঙ্গ স্বেচ্ছায় আগুনের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চায়, তাকে পুড়িয়ে আগুনের কোনো গৌরব নেই। তাকে লিখে' দিচ্ছি—খেলার যবনিকা এইখানেই প'ড়ে গেলো—সে যেন আমাকে আর চিঠি না লেখে!

দূরে সমুদ্রের সাথে আকাশ মিশে গেছে—মহা-মিলনের অন্তরালে। তার পেছনে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই মিলনের বার্ত্তা তরঙ্গের তালে-তালে

দুল্‌ছে, তার সঙ্গীত তরঙ্গের ভাষায় ছন্দিত হ'য়ে বিশ্বের বেলার উপর লুটিয়ে পড়্‌ছে।

অসীম আকাশ যেমন অশান্ত সমুদ্রকে গ্রহণ করেছে তেম্‌নি একজনকে পাইনে যে পরেশ নরেশ নয়—যে এই দুর্বিনীত নারী-হৃদয়কে আপনার প্রেমের গভীরতার দ্বারাই জয় ক'রে নিতে পারে? কে জানে কেন, প্রাণে আজ, জয় কর্‌বার নয়, পরাজিত হ'বার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হ'য়ে উঠেছে।

* * *

*
* *

১৭ই আশ্বিন—১৩২৮

জ্যোৎস্নার সমুদ্রেও আজ বান ডেকেছে। আকাশ ছাপিয়ে বাতাসের বুক ভেদ ক'রে অসংখ্য অক্ষৌহিণী তার পৃথিবী বিজয়ের অভিযানে মেতে উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে ঢেউগুলো তার চক্-চক্ কর্‌ছে। তীরের উপর কুন্দফুলের মতন সাদা ফেনার আস্তরণ।

সমুদ্র বুঝি চাঁদকে ভালোবাসে। তাই চাঁদের জন্য সমুদ্রের ক্ষ্যাপামির অন্ত নেই। চাঁদের পানে সমুদ্রের

বাহু কি বিপুল আগ্রহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—কি আকুল আর্ত্তনাদ তার বুকে! দূরের দুষ্প্রাপ্যের জন্যে এই আকাঙ্ক্ষা—এই হাহাকার—এ মানুষের চিরন্তন দুর্ভাগ্য!

কেবল মনে পড়্‌ছে সেদিনের সেই স্নানের কথা—আর সেই পাথরের মতন কঠিন অথচ করুণায় উজ্জ্বল সেই মুখখানি। সমস্তটা দুপুর তারি প্রতীক্ষায় কেটে গেছে, সমস্তটা সন্ধ্যাও তারি প্রতীক্ষায় কেটে গেলো। সে আস্‌বে না জেনেও প্রতীক্ষার নেশাটা কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। যে উপেক্ষার অপমানের সঙ্গে সে আমাকে প্রাণটা ভিক্ষার বস্তুর মতন ফিরিয়ে দিয়ে গেল, সে ভিক্ষার সঙ্গে আমার কোনো কালের পরিচয় নেই। এতকাল আমিই সকলকে অনুগ্রহ বিলিয়ে এসেছি, যাকে একটুখানি হাস্য, দু'টো মিষ্টি কথা, এক ঝলক বিহ্বল চাউনি বিতরণ করেছি, সেই আপনাকে সার্থক মনে করেছে।—আর এ তার দু'টো বাহুর ভিতর আমার বেপমান বিহ্বল তনু-লতাখানি জড়িয়ে ধ'রেও কোনো স্পন্দন অনুভব কর্‌লে না? তার মানা না-মানার তিরস্কার দু'টো চোখের কঠিন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণ তীরের মতোই আমাকে বিদ্ধ ক'রে গেলো। এখনো সে চাউনির কথা আমি ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। মহাভারতের

ভীষ্মকে কবির কল্পনার বস্তু মনে কর্‌তুম, এখন দেখ্‌ছি, মানুষের রক্ত-মাংসের দেহের ভিতরেও ভীষ্মের প্রাণ আছে।

সমস্তটা সমুদ্র দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। সাম্‌নের খানিকটা বাদ দিয়ে পেছনের সবই জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোর মধ্যে হারিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার কুহেলিকা যে মায়া রচনা করেছে, তা' আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে। এই অস্পষ্ট অজানার ভিতর হারিয়ে যাওয়ার যে একটা অপরূপ মাধুর্য্য আছে, তা' আমাকে মাতাল ক'রে তুল্‌লে। বেরিয়ে পড়্‌লুম প্রকৃতির সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের অভিসারে।

তীরে নেমে দেখ্‌লুম, আরো অনেকে বেরিয়ে পড়েছে —আমারি মতন এই অজানার অভিসারে। দলে-দলে নর-নারী জ্যোৎস্নার জোয়ারে অবগাহন কর্‌ছে। বালক-বালিকাদের একটা দল হুল্লোড় ক'রে আমার সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেলো। তাদের পায়ে-পায়ে উৎক্ষিপ্ত ভেজা বালির খানিকটা ছিট্‌কে এসে আমার গায়ে লাগ্‌লো। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমার পেছনেই একটি কিশোরী একটি কিশোরের হাত ধ'রে চলেছে। কিশোরীর মুখের লজ্জার আভা সেই অস্পষ্ট আলোতেও

রাঙা অরুণের রেখার মতন জল্‌ছে—সম্ভবতঃ এরা সত্ত-পরিণীত। দু'জনের মুখেই মিষ্টি হাসি। সেই মিষ্টি হাসিতে তাদের মুখ-দু'খানি সত্ত-প্রস্ফুটিত গোলাপের কুঁড়ি ব'লে মনে হ'লো। একেবারে সমুদ্রের ধারে বসে' একটি যুবক বালি খুঁড়ে' পিরামিড তৈরি কর্‌ছে। যে খেলা কেবল ছোট ছেলে-মেয়েদেরই মানায়, এই পরিণত-বয়স্ক যুবকের পক্ষেও তা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব'লে মনে হচ্ছে না। এই জ্যোৎস্নার মায়া-কাঠির স্পর্শে তার মন বুঝি কুড়ি বছর আগের একটা বয়সে ফিরে গেছে! দূরে—অনেক দূরে একটা বাঁশী বাজ্‌ছে। স্বর ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তার আহ্বান বাতাসকে মাতাল ক'রে তুলেছে। আমার বুকের রক্তের তালে-তালে তার ধ্বনি ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কোথায়—কত দূরে সে? পৃথিবীর এই সীমানায়, না চোখের দৃষ্টির পরপারে, যেখানে সমুদ্র ও জ্যোৎস্না পরস্পরের ভিতর আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে! পথ ক্রমেই জন-বিরল হ'য়ে উঠ্‌ছে, বাস-বিরল দেহের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের শীকর-ধোয়া ঠাণ্ডা বাতাস একটা মৃদু বেপথুর সৃষ্টি কর্‌ছে—কিন্তু বাঁশীর স্বরও ক্রমেই স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌ছে।

বাঁশী গাইছে—'সখি জাগো—জাগো।'

মায়া-মৃগ

কা'কে জাগাবার সাধনায়, কোন্ মৃত প্রিয়াকে প্রাণ দেবার জন্যে এ-যুগের 'অর্‌ফিয়াস' বাঁশীর সুরে ঝঙ্কার তুলেছে—আজ এই জ্যোৎস্না-ধোয়া উপকূলে ?

'জাগো নবীন গৌরবে
জাগো বকুল-সৌরভে'

সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায় কি তার প্রিয়া ঘুমিয়ে আছে ? নীল শাড়ীর জ্যোৎস্না-জড়ানো আঁচল ঐ বুঝি তার দুল্‌ছে ঢেউয়ের বুকে বুকে ?

'আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে'

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তীর ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এসে বেশ বড় একটা ঝিনুক আমার পায়ের উপরে ছুঁড়ে' দিয়ে গেলো। সমুদ্রের অতল শয়নে প্রবালের শয্যায় যে সাগরিকা ঘুমিয়ে আছে, গানের তান তাকেও আঘাত ক'রে বুঝি জাগিয়ে দিয়েছে ; এই ঝিনুক বুঝি তারি ঝিনুকের নৌকায় অতল সাগর পাড়ি দেওয়ার নিশানা।

একটা সাদা মেঘের আড়ালে চাঁদ তলিয়ে গেলো। অদূরে অস্পষ্ট ছায়ালোকে বাদকের মুখ দেখা যাচ্ছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না। এগিয়ে চল্‌লুম—আরো এগিয়ে ! একি,

পুরীর ডায়েরি

এ যে সেই তরুণ যুবক, যার কথা সমস্তটা তুপুর মনে পড়েছে, যার স্মৃতি সমস্তটা সন্ধ্যা ভরপূর ক'রে রেখেছিল! বাঁশী তখন গাইছিল—

'মৃত্ মলয় বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে
জাগো আকুল ফুল সাজে
জাগো মৃত্ কম্পিত লাজে
মম হৃদয় শয়ন মাঝে।'

*
* *

*
* *

১৮ই আশ্বিন—১৩১৮

সেই তরুণ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেছে সেই অভিসার-রাতের বাঁশীর আসরেই। হঠাৎ আমাকে সেই নিভৃত-নির্জ্জনে দেখে প্রথমটা সে চিন্‌তে পার্‌লে না, চোখে তখনো তার গানের ঘোর লেগে ছিল!

কিন্তু ঘোর কাট্‌তেই সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্‌লে—আপনি! ঘটা ক'রে বস্‌বার জন্যে বিছিয়ে দেবো, এমন কিছু নেই এখানে। বসুন এই বালু-বেলার সিংহাসনের

উপর। এ সিংহাসন আপনাদের ঘরের ‘কুশানে’র চাইতে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। ব’লেই সে আবার হেসে উঠ্‌ল !

শিশুর মতন সরল হাসি সমুদ্রের গর্জ্জনের ভিতর হারিয়ে গেলেও তার ঝঙ্কার বাতাসকে খানিকটা সরস ক’রে দিয়ে গেলো। মুখের সে কঠিন ভাব আর নেই। একটা আত্ম-ভোলা প্রসন্ন মিষ্টি হাসিতে তার কাঁচা মুখখানি প্রস্ফুটিত ফুলের মতন সুন্দর হ’য়ে উঠেছে। একটু তফাতে বালির উপর ব’সে পড়্‌তেই সে আবার বল্‌লে—আপনাকে প্রথম দেখে কি মনে হ’য়েছিল জানেন ? আমার মনে হচ্ছিল—সাগরিকা! জলের দোলা হ’তে সে নেমে এসেছে—এই বালু-বেলায় ব’সে জ্যোৎস্নার আলোকে আর্দ্র কেশ-পাশ শুকিয়ে নেবার জন্যে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আচ্ছা, আপনার নাম কি ?

আমি বল্‌লুম—অসিতা।

এবার তার দেহখানি অট্টহাস্যে একেবারে গড়িয়ে পড়্‌লো। অনেকক্ষণ ধ’রে টেনে-টেনে হেসে সে বল্‌লে—আপনার বাপ-মা নিশ্চয়ই রং-কাণা ছিলেন। জ্যোৎস্নার আলোকেও যার রং হার মানিয়েছে, তারই নাম অসিতা !

লজ্জায় সম্ভবতঃ আমার কানের ডগাটি-পর্য্যন্ত লাল

হ'য়ে উঠেছিল। সে বল্‌লে—এঃ! আপনি যে একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছেন! না—না। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি কর্‌ছিনে। এই জ্যোৎস্নার আলোতে আপনার হাতখানা ধ'রে দেখুন। ব'লেই সে আমার হাতখানা নিঃসঙ্কোচে নিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় তুলে' ধর্‌লে।

লজ্জায় আরো লাল হ'য়ে আমি তাকে বল্‌লুম—এখন তো আপনার মুখে কিছুমাত্র হাসির অভাব দেখ্‌ছিনে। কিন্তু আমাকে সমুদ্রের কোল থেকে যখন টেনে তুল্‌লেন, তখন মুখটা অত কালো হ'য়ে উঠেছিল কেন? জানেন, তার পর থেকে এ ক'টা দিন আমি আপনার সেই মুখ মনে ক'রে কিছু মাত্র সোয়াস্তি পাইনি।

আষাঢ়ের মেঘের মতন আবার একটা কালো বিরক্তির রেখা তার মুখের উপর ভেসে উঠ্‌লো। সে বল্‌লে—দেখুন, সমুদ্রের চেহারা দেখেই আমি বুঝেছিলুম, সেদিন একটা দুর্দ্দৈব ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। সেই জন্যে আপনাকে আমি সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম। কিন্তু আপনি সে-কথা না শুনে' আমাকে কি কষ্টটা দিয়েছেন, জানেন! এখনও আমি সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করার সে ক্লান্তি শুধ্‌রে নিতে পারিনি। মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়ে যে অবুঝ হয়—এ আমি কিছুতেই সইতে পারিনে!

আমি হেসে বল্‌লুম—আমি আর এখন সমুদ্রেও তলিয়ে যাচ্ছিনে, আপনিও আমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে সমুদ্রের সঙ্গে আর লড়াই কর্‌ছেন না, অথচ আপনার মুখ সেই সেদিনকার সকালবেলার মুখের মতোই অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু রাত হ'য়ে গেছে, এখন উঠি।

সে ত্রস্ত হ'য়ে হেসে বল্‌লে—না না, এ মেঘ নয়—এ মেঘের ছায়া। তার পরেই আমার সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে' আবার বল্‌লে, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নিভৃত নির্জ্জন বালু-বেলা। সাম্‌নে দূরে কেউ নেই। চাঁদের কিরণে সমুদ্রের চেহারা রহস্যের মায়া-পুরীর মতন মনে হচ্ছে! কালো কালো ঢেউগুলো তার প্রিয়-বিরহ-বিধুর দয়িতের অন্তরের মতন বিক্ষুব্ধ। চাঁদের আলোর হাসি তার মাথায় দুল্‌ছে—মেঘের বুকের বিদ্যুতের রেখার মতো। কিন্তু অন্ধকার তাতে কিছুমাত্র দূর হয়নি। তরুণী ধরণীর পায়ের উপর সমুদ্র আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে ফেনার ফুলের মালার অর্ঘ্য নিয়ে। একবার মনে হ'লো—সমুদ্রের কল্লোলের ভিতর দিয়ে বাঁশী বাজ্‌ছে—'সখি জাগো—জাগো।'

চারিধারে স্বপ্নের সরণী গ'ড়ে উঠেছে। তারি ভিতর

দিয়ে পথ কেটে চলেছি কি জানি কোথায়!—জায়গা মনে পড়্‌ছে না। কিন্তু তবু চলেছি। আকাশ জ্যোৎস্নার চন্দ্রাতপ মেলে দিয়েছে স্বপ্নের একখানা আবরণের মতো। পাশে সমুদ্রের ঢেউগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মায়াপুরীর রাজপথ কোন্ অজানা রহস্যের দোরে গিয়ে পৌঁছেচে। পায়ের তলায় বালু-বেলায় ফেনার ফুলের কোলে-কোলে শুক্তির মুক্তা ছড়ানো। মন দুল্‌ছে—বাঁশী বাজ্‌ছে—'সখি জাগো—জাগো'.........

হঠাৎ জেগে দেখ্‌লুম—সেই লাল বাড়ীটার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। মায়া-পুরীর পথ এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেলো! ফুরাক্, কিন্তু তার নাম জেনে নিয়েছি—'অলক'। আর আজ সমস্ত রাত জেগে ডায়েরিতে লিখ্‌ছি—'অলক—অলক!'

আকাশের গায়ে আলোকের পূর্ব্বাভাস জেগে উঠেছে। অরুণের আলো উষার অলকে আবীর মাখিয়ে দিয়ে বল্‌ছে—

—'সখি জাগো—জাগো।'

*
* *

৩০শে আশ্বিন—১৩২৮

কয়েকটা দিন জল-হারা মেঘের মতন হাল্কা হাওয়ায় উড়ে' গেলো। যে শ্রান্তি এসে পড়েছিল মনের কোণে আজ তার কোনোই সন্ধান পাচ্ছিনে। মন তাজা হ'য়ে উঠেছে, প্রাণের ভিতর তপ্ত তরুণ শোণিতের ধারা ছুল্‌ছে।

অলকের সঙ্গে বালু-তটের উপর ঘর বেঁধেছি—ঘর-নীড়-হারা পক্ষী-শাবকের মতন। চলার বিরাম নেই, তবু পায়ের তলায় ক্লান্তি অনুভব কর্‌ছিনে। চল্‌ছি,

তবু মনে হচ্ছে—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' চরণ-তলে সমুদ্রের বিশাল পাথার প'ড়ে রয়েছে—ঠিক মরুভূমির নতোন্নত বিস্তারের মতো। শূন্যে অপরিমাণ ব্যোম মদের মতন মেঘের ফেনায় ফুলে' উঠেছে। মনের বেদুইন তা'কে পান ক'রে নিঃশেষ কর্‌তে পার্‌ছে না।

সমুদ্রের বুকের উপর রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে। একটা ঝাউ গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে অলক বাঁশী বাজাচ্ছিল—

'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

ছল্‌-ছল্‌ উচ্ছল জলের তালে-তালে তার সুর কান্নার মতো ক'রে আমার কানে এসে বাজ্‌লো। আজ ক'দিন হ'তেই অলককে উন্মনা ব'লে মনে হচ্ছে। আমি তার হাতে ধ'রে বল্‌লুম—থামাও গো বন্ধু, তোমার কান্নার সুর থামাও।

আমার হাতের ভিতরে হাতটা ছেড়ে দিয়ে অলক বল্‌লে—কান্নার যে সময় এসেছে অসিতা। আমার আহ্বান এসেছে—অজানা পথের প্রান্ত হ'তে, নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে। আমি বিদায় নিতে চাই।

বিদায়!—কথাটা বুকের ভিতর কাঁটার মতন খচ্‌

ক'রে বিঁধ্‌তেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। তবু চোখের জল তার দৃষ্টি এড়ালো না।

সে দু'হাতে আমার মুখটা টেনে তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—অনেক চোখের জল আমার মনের মরু-ভূমিতে প'ড়ে আপনি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এ যে বন্যার প্লাবন! তোমার চোখের জল আমার মনকে যে দুলিয়ে দিচ্ছে, অসিতা!

আমি বল্‌লুম—তবে বলো, যাওয়ার কথা কখনো বল্‌বে না।

দুপুরের যে রোদন সাগরের জলে অবগাহন কর্‌ছিল, তারি মতো ম্লান হেসে অলক বল্‌লে—কিন্তু না গেলে যে-চোখের জল আজ ফেল্‌ছ, তা আর কখনো শুকোবার অবকাশ পাবে না। আমার ইতিহাসটা তবে শোনো।

একটু চুপ ক'রে থেকে, হঠাৎ ধনুকের মতন বাঁকা চোখের পাতা দু'টো টেনে তুলে' একটা উদাস-বিহ্বল দৃষ্টির বাণ আমার মুখের উপর নিক্ষেপ ক'রে অলক বল্‌তে সুরু কর্‌লে—

বাংলার বিপ্লব-যুগে যারা ধ্বংসের যজ্ঞানলে হবির

কাঠ যুগিয়েছে, তাদের সঙ্গেই আমিও মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়েছি। অলক রায়ের নাম হয়তো তোমারো অপরিচিত নয়। এখনো তার নামের হুলিয়া পুলিশের থানায়-থানায় ঝোলানো আছে।

আজো মনে পড়্‌ছে আমার সেদিনের সেই প্রলয়-নৃত্যের কথা। মাথার উপরে খড়্গ ঝুল্‌ছে, পেছন থেকে মৃত্যুর দূত ছুটে' আস্‌ছে, আর সাম্‌নে এগিয়ে চলেছি আমরা—নির্দ্দয় উল্লাসে আত্মভোলা সন্তানের দল। টোটা-ভরা রিভল্‌ভার কখনো হয়তো আঙুলের ইঙ্গিতে অট্টহাস্যের আর্ত্তনাদে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তো, পর মুহূর্ত্তেই হয়তো আবার পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়্‌তো নিভৃত বুকের দোলার উপরে।

কত রাত যে আমাদের সেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় দিনের কর্ম্ম-কোলাহলে ভ'রে উঠেছে, আর কত দিন যে রাতের ক্লান্ত অবসাদে ডুবে' গেছে, আজ গুণে'ও তার সংখ্যা নির্ণয় কর্‌তে পারিনে। আমাদের তখনকার গতি ছিল উল্কার দীপ্তির মতন, তা কেবল দগ্ধই কর্‌তো না, ভীতিরও সঞ্চার কর্‌তো।

দেশের লোকের সেবা কর্‌তে গিয়ে আমরা দেশের লোকের পর হ'য়ে গিয়েছিলুম। আত্মীয়েরা আমাদের

সহ্য কর্‌তে পারেনি, বন্ধুরা ভয়ে আমাদের পরিত্যাগ করেছিল। তবু আমাদের পণ টলেনি, মন দোলেনি। রক্তের স্রোতের উপর দিয়ে ধ্বংসের পথে আমাদের তরী ভেসে চলেছিল। এ যে আমরা পেরেছিলুম তার কারণ, আমরা, যারা দেশের সেই একান্ত দুর্দ্দিনে বিপ্লবের দলে নাম লিখিয়েছিলুম, দেশকে তারা সত্য-সত্যই ভালোবাস্‌তুম্। সে ভালোবাসার গভীরতা তোমার সাম্‌নের ঐ সমুদ্র হ'তে কিছুমাত্র কম নয়। তার ঢেউ আঘাতের পর আঘাতে আমাদের সহিষ্ণু-তার সীমাকে লঙ্ঘন করেছিল, তাই কূল ছাপিয়ে উঠ্‌তে আমরা ইতস্ততঃ করিনি। সে বন্যায় কে ডুবেছে, কে ডোবেনি তার সন্ধান রাখ্‌বার আমাদের অবসর ছিল না।

কিন্তু সে-দিনকার মেঘ কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা আমাদের হিংসা ভুলেছি। অথচ যারা যথার্থ অপরাধী, তারা তাদের হিংসার আগুন রাবণের চিতার মতো ক'রেই জ্বালিয়ে রেখেছে। কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, কাউকে আন্দামানে অসভ্যদের অস্বাস্থ্যকর আব্‌-হাওয়ার ভিতর নির্ব্বাসিত ক'রে, কাউকে আবার কারা-প্রাচীরের আবেষ্টনের ভিতর আবদ্ধ রেখে তখন

তারা প্রতিশোধ তো নিয়েইছে, আজ যারা সব ছেড়ে নিজের নির্ব্বাসন নিজে বরণ ক'রে নিয়েছে, তাদেরো তারা সোয়াস্তি দিচ্ছে না। অনুসন্ধানের দুর্দ্দান্ত কুকুর এখনো তাদের পেছন-পেছন ঘুর্‌ছে। .

তিন দিন আগে আমি জান্‌তে পেরেছি, পুলিশ সন্ধান পেয়েছে, পুরীর বালু-তটের উপর অলক রায়ের খোঁজ মিল্‌তে পারে। ধরা দিতে আমি একটুও ভয় পাচ্ছিনে। ফাঁসির দড়ি ফুলের মালার মতন বরণ ক'রে নিয়েই মানুষ বিপ্লবের খাতায় নাম লেখায়। কিন্তু তবু তোমার কথাটাও যে আজ ভুল্‌তে পার্‌ছিনে, অসিতা !……

ওগো রুদ্র পথের পথিক, তোমার মুখে হাসি দুল্‌ছে, কিন্তু আমার বুকে যে ভয়ের সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌ছে, কান্না যে আসন্ন আষাঢ়ের মেঘের মতো ক'রেই সেখানে জল-ধারার সৃষ্টি কর্‌ছে। ঝড়ের আগে ধরণীর বুকের নিঃশ্বাসের স্পন্দন যেমন থেমে যায়, আমার বুকের নিঃশ্বাস তেম্‌নি বেরিয়ে আস্‌বার পথ খুঁজে পাচ্ছে না !

দুই হাতে মুখ ঢেকে বালির উপর লুটিয়ে প'ড়ে বল্‌লুম —তবু তুমি এখনো আমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছো বন্ধু, এখনো পালাওনি ! কি নিষ্ঠুর তুমি ! কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত—আর এক দণ্ডও এখানে তোমার থাকা চল্‌বে না।

পুরীর ডায়েরি

অলক আবার একটু হেসে বল্‌লে—কোথায় যাবো? পালিয়ে-পালিয়ে জীবনের উপর ঘৃণা ধ'রে গেছে। তবু এখানকার স্মৃতিটি ভারী মিষ্টি লাগ্‌ছে। সমুদ্রের এই মাত্‌লামি মনে আবার একটা নতুন মত্ততার সুর জাগিয়ে তুলেছে, এখানে তোমার সঙ্গ পাচ্ছি। যদি মর্‌তেই হয়, এর চাইতে ভালো জায়গা আর কোথায় পাবো?

তার সাম্‌নে সোজা হ'য়ে ব'সে বল্‌লুম—কিন্তু মরা তোমার হবে না অলক! তোমার জীবন নিয়ে তুমি যা-খুসি কর্‌তে পারো। তাই ব'লে আমার জীবনটাকে তো আমি ব্যর্থ হ'তে দিতে পারিনে। তুমি কি এখনো বুঝ্‌তে পারোনি, যে আমার জীবন সফল ক'রে তুল্‌তে হ'লে তোমার জীবনের দরকার সকলের আগে?

অলকের মুখটা আমার মুখের ওপর নেমে এলো এক-ঝলক জ্যোৎস্নার মতন এক-থোকা ফুলের কুঁড়িকে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে। এ-স্পর্শ আমার কাছে নতুন, কিন্তু বুকের ভিতর তা যে নব-বসন্তের সূচনা ক'রে গেলো, তা নর-নারীর চিরন্তন জিনিষ।

স্বপ্নের ঘোর কাট্‌তেই হঠাৎ চেয়ে দেখি অলকের মুখ আমার বুকের উপরে ঝুঁকে 'পড়েছে, সে বল্‌ছে—কিন্তু কোথায় যাবো?

নিরাশায় তার কণ্ঠস্বর তখন শ্রাবণের ঘনায়মান সন্ধ্যার মতোই ভারী হ'য়ে উঠেছে।

আমি তাকে হাত ধ'রে তুলে' বল্‌লুম—সমুদ্রের এপারে আমাদের জায়গা না হয়, ওপারে জায়গা হবেই। এত বড় তুনিয়াটা প'ড়ে রয়েছে—তার বুকে স্থানের অভাব হবে না।

একটা দিনের ইতিহাস

একটা দিনের ইতিহাস

সকালে

সেদিন কি একটা ছোট-খাট যোগ ছিল। গঙ্গার ঘাটটা লোকের মাথায় মাথায় একেবারে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে। রাধারাণী প্রায়ই যেতো এই গঙ্গার ঘাটে স্নান কর্‌তে, কিন্তু ভিড় বাঁচিয়ে। সহসা সেদিন এই ভিড়ের ভিতর এসে প'ড়ে তার মনটা গোড়াতেই একেবারে খিঁচে গেলো।

মায়া-মৃগ

গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে ছোট ছোট ষ্টিমারগুলো হাউই-এর মত সাঁই সাঁই ক'রে ছুটে' যাচ্ছিল—দু'ধারে ফেনার বুদ্বুদের ফুল ফোটাতে ফোটাতে। ওপারের কলগুলোর মুখ হ'তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে' বাতাসে ছড়িয়ে প'ড়ে এ-পারের জলের উপর একটা আলো-ছায়ার আস্তরণ গ'ড়ে তুলেছে। ফুলের মালাগুলো তরঙ্গের দোলায় দুল্‌ছে—ডুবোরী-ছেলেরা পুণ্যার্থীদের গঙ্গায় দেওয়া ডাবগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্য হুড়োহুড়ি কর্‌ছে—সমস্ত মিলে উৎসবের যে একটা বিরাট্ আনন্দ গঙ্গার কূলে কূলে জমাট হ'য়ে উঠেছে, ভিড়ের ভিতর দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে রাধারাণী যে তা দেখে নেবে, সে ধৈর্য্যও তার ছিল না। তাড়াতাড়ি কোনো রকমে স্নানটা সেরে বাড়ী ফির্‌বে মনে ক'রে সে ঘাটের উপর এক মুহূর্ত্তও দেরি না ক'রে জলের ভিতর নেমে পড়্‌লো।

কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা তার অদৃষ্টে লেখা ছিল না। জলে পা দিতেই তার চোখ্ গিয়ে পড়্‌লো কমলার উপরে। এই কমলাই এক সময়ে ছিল রাধারাণীর সব চেয়ে বড় বন্ধু—যাকে বলে একেবারে মনের মিতা। দু'জনে তারা এক গাঁয়েরই মেয়ে—ছেলে-বেলায় দু'জনে এক সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে। যৌবনের

একটা দিনের ইতিহাস

প্রারম্ভে তাদের বিয়েও হ'য়েছিল এক গাঁয়ে। তারপর কমলা চুটিয়ে স্বামীর ঘর কর্‌ছিল আর রাধারাণী কর্‌ছিল অদৃষ্টের ফেরে কুলে কালী দিয়ে সহরের পথে দেহের বেসাতি। ······

কমলার সঙ্গে দু'টো কথার আদান-প্রদান কর্‌বার জন্যে রাধারাণীর মন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু ভয়ের হাতও সে এড়াতে পার্‌লে না······কমলা যদি কথা না কয়! যে কমলা তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রেও সোয়াস্তি পেতো না, যে কমলা দিনের শেষে একদণ্ড অন্ততঃ তার সঙ্গে মিলনের আশায় সংসারের সকল তিরস্কার হাসি-মুখে সহ্য করেছে, সেই কমলার সঙ্গে দু'টো কথা······না, সাহসে কুলোয় না।

রাধারাণীর সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে ধিক্কারের গ্লানি উল্কার মতো একটা জ্বালার জ্বলন্ত রেখা টেনে দিয়ে ছুটে' গেলো। সে গ্লানির কাছে তার স্নানের কথা, তার ফিরে যাবার কথা কোথায় যে ভেসে গেলো, তা সে বুঝ্‌তেও পার্‌লে না। তার একান্ত অজ্ঞাতেই তার চোখের সাম্‌নে ফুটে' উঠ্‌লো পল্লী-গ্রামের তার সেই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার চেহারাটা। সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, এই এখনকার

উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চেয়ে কি ভালো ছিল তার সেই সংহত সংযত জীবন!......

ছোট্ট তাদের বাড়ীটি। খান-কতক খড়ের ছোট-বড় ঘর, দাওয়া ও উঠান গোবর দিয়ে নিকানো—ঝক্-ঝকে তক্-তকে। সেই বাড়ীর সাম্‌নেই হাত পনেরো জমীতে কয়েকটি ফুলের গাছ—যূঁই, বেলী, চামেলী, গাঁদা, ঝুম্‌কো-লতার অজস্র ফুলে ফুলময়। গোয়াল ঘরের চালায় লাউ-কুম্‌ড়োর লতা লতিয়ে লতিয়ে উঠে' ঘরখানাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। সেই কুল গাছটি, যার অজস্র কুলের লোভে শীতের দিনেও ভোর না হ'তেই লেপের মায়া ছেড়ে পাড়ার ছেলেগুলোর জটলা স্বরু হ'য়ে যেতো। ভাই, বোন্, বাপ, মা—আর একটি লোক, যার সমুদ্রের মতো গভীর ভালোবাসা চোখের নেশায়, খেয়ালের ঝোঁকে··· রাধারাণী আর ভাব্‌তে পার্‌লে না। তাদের সংবাদের জন্য তার মনের ভিতরটা গঙ্গার ঢেউয়ের মতো ক'রেই তুল্‌তে লাগ্‌লো।

তুই হাত দিয়ে জল কেটে রাধারাণী তাড়াতাড়ি ছুটে' চল্‌লো কমলার দিকে। তার ভিতর যে একটা অপবিত্র নারী দিবা-রাত্র জেগে ব'সে তার ফির্‌বার পথ রুদ্ধ ক'রে পাহারা দিচ্ছে, তা আর তার মনেও পড়্‌লো না।

পাশে প্রায় এসে পড়েছে হঠাৎ সে শুন্‌তে পেলে— আ-মর্‌, খান্‌কি মাগীর রকম দেখো, নিজের গরবেই ভরপুর। কলসী ভ'রে নিয়ে উঠে' যাচ্ছি, দিলে ছুঁয়ে।

রাধারাণী চেয়ে দেখ্‌লে তাদেরি পাড়ার গোব্‌রার মা, তার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে আছে। তার বুকের ভিতরটা ধরাস্‌ ক'রে উঠ্‌লো। পাছে কমলার চোখের সঙ্গে তার চোখ্‌ পড়ে যায়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি জলের তলে তলিয়ে গেলো। তারপর যেখানে গিয়ে উঠ্‌লো, জনারণ্যের ব্যূহ ভেদ ক'রে সেখান থেকে কমলাকে আর নজরে পড়ে না। একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মনটাকে সে হাল্‌কা ক'রে নেবে মনে কর্‌লে! নিঃশ্বাসও একটা তার বুকের ভিতর হ'তে বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু সে যেন তার বুকের ভারী কান্নারি মতো একেবারে ব্যথার বাষ্পে ঘেরা।

দু'হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধ'রে রাধারাণী আবার ভাব্‌তে স্থরু ক'রে দিলে! হঠাৎ তার মনে হ'লো—ব্যর্থ —ব্যর্থ, কি ব্যর্থ তার এই জীবনটা—একেবারে কালো-মেঘের মতো ঘন নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভরা। তার জীবন-দিগন্তের একপ্রান্ত হ'তে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত এই মেঘের রেখা চ'লে গিয়েছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক

নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে বটে, কিন্তু সেও একেবারে বজ্রের জ্বালায় জ্বালাময়।

অথচ এই অন্ধকার—এ তো তার নিজের হাতেরই গড়া! স্বামীর স্নেহে তো তার এতটুকুও খাদ ছিল না। তার নিজের সংসার, যেখানে সে-ই ছিল সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সেই তো সে সংসারকে পায়ে দ'লে চ'লে এসেছে, কিন্তু কেন?...সেই পুরাণো ইতিহাস! নিজের আখ্যায়িকার সেই ছোট-খাট টুক্‌রাগুলো বায়োস্কোপের ফিল্‌মের মতো জোড়া লেগে লেগে তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো!......

পাশের বাড়ীর সেই তরুণ যুবা, নাম তার অরুণ। রঙ্‌ তার প্রভাত অরুণের প্রথম রেখার মতোই লালে-হলুদে মেশানো অপূর্ব্ব। চোখ্‌ দু'টো সন্ধ্যাকাশের অন্ধকারে সদ্য ফুটে-ওঠা দু'টো তারার মতো জ্বল্‌জ্বলে। গানে সে শুনেছিল "মদন মনোহর বেশং"—এ যে তাই! জান্‌লা দিয়ে সে তাকিয়ে থাক্‌তো রাধারাণীর দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে। পথ-হারা মেঘের মতো সে দৃষ্টি কি যে ব্যাকুলতায় ভরা, তা·সেইদিনই রাধারাণী বুঝ্‌তে পার্‌লে, যেদিন দু'জনার চোখে চোখে মিলে গেলো। তার পর তার থেকে যে বিদ্যুতের সঞ্চার হ'লো, তাতেই তার

সোনার ভবিষ্যৎ ধ্বসে, ভেঙে, টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে খ'সে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়্‌লো।

হঠাৎ একখানা বড় ষ্টিমার তার গতি-বেগের করাত দিয়ে গঙ্গার বুকটাকে চিরে দিয়ে চ'লে গেলো। একটা ঢেউ প্রায় আধখানা দরিয়ার জলরাশিকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে তুলে' তাকে আঘাত করতেই রাধারাণীর স্বপ্ন ভেঙে গেলো। সে যেমন বিরক্তি-ভরা মন নিয়ে জলে নেমেছিল, তেম্‌নি বিরক্তি-ভরা মন নিয়ে ডাঙায় উঠে' বাড়ীর পথ ধর্‌লে। ফেরার পথে আপনার মনে মনেই সে অনেক বার ক'রে শপথ কর্‌লে—আর না—আর না—এ পথে আর না।

*
* *

দুপুরে

নিস্তব্ধ দুপুরের আত্মা মূর্চ্ছাহত রাত্রির মতো ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সহরের সাদা দালানগুলোর দেয়ালে রৌদ্র-দানবের হাসি কঙ্কালের সাদা ধপ্-ধপে হাড়গুলোর মতোই বীভৎস হ'য়ে উঠেছে। রাস্তা জন-বিরল। এই নিদ্রাতুর কলিকাতার যে দু'-একটা অঞ্চল আরো বেশী ক'রে ঝিমিয়ে পড়েছে রাত্রির বেসাতিটা বিপুল উৎসাহে জমিয়ে তোল্‌বার জন্যে, তারি একটা অঞ্চলের একটা বাড়ীর ছোট ঘরে রাধারাণী স্নান ক'রে এসে সেই যে দরজায় খিল দিয়েছে আর খোলেনি।

একটা দিনের ইতিহাস

রাধারাণী ভাব্‌ছে অনেক কথা—তার শৈশবের কথা, তার কৈশোরের কথা, তার প্রথম যৌবনের কথা, অবশেষে তার এখনকার কথা। এগুলো সব তাল পাকিয়ে ভিড় কর্‌ছিল তার মনের দোরে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ পিচ্‌কিরীর মতো ক'রে তার দেহের উপর লুটিয়ে প'ড়ে যে একটা জ্বালার সৃষ্টি কর্‌ছে সেদিকে তার কোনোই হুঁস্‌ ছিল না।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়্‌তেই সে তোরঙ্‌ খুলে' তিনটি চিঠির তাড়া বা'র ক'রে নিয়ে এলো। অনিশ্চিত পথ-যাত্রার সঙ্গে সে যে-জিনিষগুলো নিয়ে এসেছিল, এই চিঠিগুলোই ছিল তার ভিতর অবান্তর জিনিষ। কাজের জিনিষগুলো পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে আজ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। এই অকেজো চিঠিগুলো ট্রাঙ্কের ভিতর যেমনভাবে পড়েছিল, তেম্‌নি ভাবেই প'ড়ে থাকায় নষ্ট হ'বার অবকাশ পায়নি।

রাধারাণী তার সই কমলার চিঠির তাড়াটাই সকলের আগে খুলে' একখানা চিঠি বেছে নিয়ে পড়্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

কমলা লিখেছে—সই, সহজ বাধাটাই কঠিন মনে ক'রে নিয়ে, কাছের জিনিষটাকে দূরের ক'রে রহস্য গ'ড়ে

তোলার ভিতর যে একটা ব্যথার আনন্দ আছে, তারি নেশায় আমার মন আজ মশ্‌গুল্ হ'য়ে উঠেছে। তাই তোর বাড়ী না যেয়ে আজ ঘটা ক'রে এই চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লুম। দু'টি পা বাড়িয়ে যে জিনিষটা পাওয়া যেতো, চিঠির ডাক বসিয়ে তার ভিতর ব্যবধানের সৃষ্টি কর্‌ছি। এই দুপুরের নির্জ্জনতার ভিতর তোকে কাছে পাওয়ার যে ইচ্ছা, তাকে ইচ্ছে ক'রেই বাধা দিলুম। মনে মনে তুই হয়তো রাগ কর্‌বি, কিন্তু এই দুপুরের বিরহের পর সন্ধ্যার মিলনটা যে-গভীর আনন্দে নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌বে, তারি কথা মনে ক'রে আমি আমার নিজের চার-পাশে এই ব্যথার জালটা গ'ড়ে তুল্‌তে সঙ্কোচ অনুভব কর্‌ছিনে।

আজকের দুপুরটা ঠিক রাত্রের মতোই দেখাচ্ছে। আকাশে আলো ঠিক্‌রে পড়্‌ছে বটে, কিন্তু রাত্রির থম্-থমে নিস্তব্ধতা তার আলোকেও যেন অন্ধকারের যবনিকায় ঘিরে দিয়েছে। আমার মনে কি হয় জানিস্? আমার মনে হয়, তোকে কাছে পেলে আর কাউকে না পেলেও আমার জীবনটা বোধ হয় দুঃসহ বোঝার মতো না হ'য়েই কেটে যায়। উনি তো তোর হিংসেয় সারা হ'য়ে গেলেন। ওঁর ধারণা, আমি তোকে যতটা ভালোবাসি, ততটা

ভালোবাসা নাকি তাঁকেও দিইনি। তাঁর এ হিংসা আমি মাঝে মাঝে ফোঁড়ন দিয়ে উস্কিয়ে তুলি। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোকে বাদ দিয়ে শুধু স্বামীকে নিয়েও আমার জীবন হয়তো খুব ভালো ভাবে কাট্‌বে না। পুরুষ নারীর দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটাতে পারে সত্য, কিন্তু এই ক্ষুধা ছাড়াও আরো একটা জিনিষ আছে। সেটা যে কি, তা হয়তো আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু কেবল নারীই নারীকে তা দিতে পারে। স্বামীর কাছে কি যে পেয়েছি আর কি যে পাইনি, তাঁকে কি দিয়েছি আর কি যে দেইনি, তার আলোচনা কেবলমাত্র করা চলে আপনার মনের সঙ্গে, আর কেবল সেই নারীর সঙ্গে, যে আপনার চাইতেও বড়—আপনার চাইতেও বেশী প্রিয়।

সত্যি ভাই, ভগবান বড় বাঁচিয়ে দিয়েছেন যে আমরা দু'জনে একই গ্রামে জন্মেছিলুম এবং দুই পাশাপাশি বাড়ীর বউ হ'য়ে এসেছি। তোকে না হ'লে যে আমার এক মুহূর্ত্তও চল্‌তো না, তা আজও বুঝ্‌তে পার্‌ছি তোকে এই চিঠি লিখ্‌তে ব'সে।

*　　*　　*　　*

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে' ফেলে রাধারাণী

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে সে তাড়াটা বেঁধে ফেলে স্বামীর চিঠির তাড়াটা খুলে' প্রথম চিঠিখানা তুলে' ধর্‌তেই তার চোখে পড়্‌লো "প্রিয়তমাসু"... ...

সব বাহুল্য-বর্জ্জিত এই অতি সাধারণ সম্বোধনটি তার শরীরের ভিতর একটা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে গেলো। কোনো বাহুল্য নেই, অথচ কি বিপুল বিশ্বাস, কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, কি সুগভীর আত্মদান ঐ একটি কথার ভিতরে! জগতের সমস্ত নর-নারী এতদিন ঐ একটি কথার ভিতর দিয়ে তাদের অন্তরের প্রেমকে জানিয়ে এসেছে, কিন্তু তথাপি তার নূতনত্বের কোথাও এতটুকু হানি হয়নি। রাধারাণীর হৃদয় গুম্‌রে উঠে' তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে আঘাত ক'রে বল্‌লে,—এই ভালোবাসাকে তুই হাতের মুঠোর ভিতর পেয়েছিলি, কিন্তু রাখ্‌তে পারিস্ নি... ... অশ্রদ্ধায় পায়ের তলায় মাড়িয়ে চ'লে এসেছিস্।—হায়রে হতভাগিনী!

পত্রখানি অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের। স্বামী লিখেছেন —"আর কতদিন থাক্‌বে ওখানে? এ ঘর যে একেবারে অচল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অচল হ'য়ে উঠেছে আমার মন। কোনো কাজে আমি সোয়াস্তি

পাচ্ছিনে। তোমার সংসার—তোমার স্বামী, এদের ভার তুমি এসে গ্রহণ করো শীগ্‌গির—আমাকে আবার খুসী মনে কাজ করবার শক্তি ফিরিয়ে দাও।”

কি নিবিড় বিশ্বাস-ভরা ভালোবাসা! অথচ এই ভালোবাসার কী অপমান সে ক'রে এসেছে! রাধারাণীর সমস্ত অন্তর বিষের জ্বালায় বিষিয়ে উঠ্‌লো। তার মনে হ'লো, এ চিঠিগুলোকে স্পর্শ ক'রে অপবিত্র করবার কোনো অধিকার তার নেই। চোখ্‌ তার জলের বন্যায় ভ'রে গেলো। অস্পৃশ্য ভক্ত যেমন দেবতার বিগ্রহের পানে বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে থাকে, স্পর্শ করতে সাহস পায় না, তেম্‌নি একটা গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা নিয়ে সে চিঠি-গুলোর দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইলো। তারপর চিঠিখানা একবার চোখের উপর বুলিয়ে, বুকের উপর চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে গুটিয়ে সমস্ত তাড়াটাই বেঁধে ফেল্‌লে।

এইবার তার চোখ্‌ পড়্‌লো অরুণের চিঠির তাড়াটার উপরে। তার মনে হ'লো, যেন একটা অশুচি অস্পৃশ্য জিনিষ তার বিছানার উপর জ'মে উঠে' দুর্গন্ধ বিস্তার করছে—ঘরের বাতাস আর মনের স্বাস্থ্য তারি আব্‌হাওয়ায় যেন বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। এই অস্পৃশ্য জিনিষটার সংস্পর্শ হ'তে

তার পবিত্রতম ছু'টো জিনিষ—চিঠির আর ছু'টো তাড়াকে সরিয়ে নেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে' দাঁড়ালো। অরুণের চিঠিগুলিকে আগুনে সমর্পণ করবার কল্পনা ক'রে—স্বামী ও সখীর চিঠির তাড়া বাক্সে বন্ধ ক'রে সে যখন আবার বিছানায় এসে বস্‌লো, তখন তার মন ক্লান্তিতে ভ'রে গেছে, দেহ অবসাদে অসাড় হ'য়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে বালিসটাকে বুকে আঁকড়ে ধর্‌তেই তার ক্লান্ত চোখ্‌ ঘুমের আবেশে জড়িয়ে গেলো—যে ঘুম সমস্ত ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত অবসাদকে মায়া-লোকের সোনার কাঠির স্পর্শে মূর্চ্ছিত ক'রে রেখে যায়। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়্‌বার আগে সে মনকে দিয়ে বার বার ক'রে বলিয়ে নিলে—আর না—আর না—এ পথে আর না!

*
* *

সন্ধ্যায়

বেলা ছয়টা। সন্ধ্যার দেরী নেই, কিন্তু তার আগেই আকাশটা ধোঁয়ার মেঘে ধূসর হ'য়ে উঠেছে। সরু গলি, তারি দু'পাশে কল্‌কাতা সহরের ডানা-কাটা পরীরা ঘরের দাওয়ায় শীকারের সন্ধানে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল। দিনের বেলায় যে গলিটা নির্জ্জন ছিল ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধ-কারে তার বুকে লোকের আনাগোনার অন্ত নেই।

হঠাৎ রাধারাণীর ঘুম ভেঙে গেলো। ধুড়্-মুড়্ ক'রে উঠে' বস্‌তেই তার মনে প'ড়ে গেলো, তার গা-ধোয়া হয়নি, কাপড় ছাড়া হয়নি। তার বাবু হয়তো এখনি এসে পড়্‌বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সকাল ও দুপুরের স্মৃতির

কাঁটাটাও তার বুকের ভিতর খচ্ ক'রে উঠ্‌লো। বিরক্ত হ'য়ে সে মনে মনে ভাব্‌লে, দুর্ হোক্‌গে ছাই। কর্‌লেই বা রাগ—মানুষের শরীরের তো ভালো-মন্দ আছে—এক-দিন যদি আমি বসাতে না-ই পারি। কর্‌লেই বা রাগ—এ পথ তো আমি ছেড়েই দিচ্ছি।

হঠাৎ তার দোরে ঘা পড়্‌লো—বাইরে থেকে গোলাপী ডেকে বল্‌লে—হ্যাঁ-রে 'পচা-জল' আজ কি তুই উঠ্‌বিনি—সন্ধ্যা যে গড়িয়ে গেলো।

রাধারাণী বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বল্‌লে—না, আমি ওঠ্‌বো না—তাতে তোদের কি ?

গোলাপী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে' বল্‌লে—ওমা, মানিনীর আমাদের মান হয়েছে ! তা দাঁড়া, যে মান ভাঙ্‌বে, সে এই এসে হাজির হ'লো ব'লে !

আবার সব নিস্তব্ধ। ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বাইরে হারমোনিয়মের শব্দ, বাঁয়া-তব-লার চাঁটি, বিহ্বল ও মত্তকণ্ঠের গান—সমস্ত মিলে পাড়া-টাকে গুল্‌জার ক'রে তুলেছে। এই নিত্যাভ্যস্ত ব্যাপার-গুলি রাধারাণীর বুকের ভিতর রক্তের অণু-পরমাণুগুলোকে যেন মাতাল ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লো। অন্ধকারের ভিতর সেগুলো মানুষের হাতে স্পর্শের মতো ক'রেই যেন তাকে

একটা দিনের ইতিহাস

ধাক্কা দিতে দিতে বল্‌তে লাগ্‌লো—ওরে ওঠ্‌—ওঠ্‌—সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, তোর গা-ধোয়া হয়নি, কাপড় ছাড়া হয়নি, চুলগুলো বিশ্রী-ভাবে এলিয়ে প'ড়ে আছে—প্রসাধনের জিনিষগুলো 'টিপয়ের' উপর প'ড়ে কাঁদ্‌ছে, ওঠ্‌ রাধারাণী, ওঠ্‌! যৌবন ও রূপ এ-দু'টো জিনিষ বড় তোয়াজ ক'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়।

যন্ত্র-চালিতের মতো উঠে' দাঁড়িয়ে রাধারাণী তাড়াতাড়ি বিদ্যুতের বাতির স্বুইচ্‌টা টিপে দিলে। অন্ধকার ঘর আলোকের বন্যায় ভেসে গেলো। হঠাৎ আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই রাধারাণী দেখ্‌তে পেলে, তার চেহারা কি বিশ্রী—কি নোংরা দেখাচ্ছে এই কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই। চিন্তার রেখাগুলো তার ললাটে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠেছে, গাল কুঁচ্‌কে গেছে, রং ফ্যাকাশে,······এই কি জরার আগমনের পূর্ব্বাভাস!

ভয়ে, ভাবনায় পাগলের মতো হ'য়ে রাধারাণী ছুটে' গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুক্‌লো। মিনিট কুড়ি পরে স্নানের ঘর থেকে তার সেই চিরদিনের বেশ-ভূষায় সজ্জিত হ'য়ে বেরিয়ে এসে রাধারাণী আবার ব'সে ভাব্‌তে সুরু ক'রে দিলে। সে ভাবনার আগা নেই, গোড়া নেই, আদি নেই, অন্ত নেই।

এই নেতিয়ে পড়া মন নিয়ে সে যখন অতিমাত্রায় বিব্রত হ'য়ে উঠেছে, তখনি ঘরে ঢুকে' যূঁই বল্‌লে—হ্যাঁলা কি হয়েছে তোর আজ, যে অমন মন-মরা হ'য়ে ব'সে র'য়েছিস্ ?

রাধারাণী বল্‌লে—কি-যেন ভাই, কিছুই যেন ভালো লাগ্‌ছে না আজ।

যূঁই হেসে আবার বল্‌লে—"মর্ নেকী, মন ভালো কর্‌বার অমন জিনিষ রয়েছে তোর আলমারীর ভিতর, তবু মন ভালো লাগ্‌ছে না! দে, চাবি দে।

*   *   *   *

রাধারাণীর ঘরে আসর জ'মে উঠেছে। কখন যে তার বাবু এসে ঘরে ঢুকেছে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে, তা রাধারাণী খেয়ালও করেনি। তবলার চাটি, হারমোনিয়মের ঝঙ্কার, তার সঙ্গে মেয়ে ও পুরুষ-কণ্ঠের বেতালা চীৎকার,—এগুলো সব মিলিয়ে রাধারাণীর ঘরের ভিতরেই এখন নরক গুল্‌জার হ'য়ে উঠেছে। রাধারাণীই ছিল ও-বাড়ীটার ভিতর সব চাইতে সংযত। আজ তাকেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠ্‌তে দেখে তার বাবু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—হঠাৎ যে আজ এত বে-সামাল হ'য়ে পড়্‌লে রাণী ?

রাধারাণী ফিক্ ক'রে একটু হেসে উঠে' তাকে উত্তর

দিলে—কি-যেন ভাই, মন্‌টা আজ যেন কেন খুলে' গেছে।

হঠাৎ পাশ থেকে একজন চীৎকার ক'রে উঠে' বল্‌লে—বাঃ বাঃ, এ গুলো কি—বলেই বিছানার এক পাশ থেকে অরুণের চিঠিগুলো তুলে' ধর্‌লে।

রাধারাণী তার সঙ্গে সঙ্গে সমান জোরে চীৎকার ক'রে উঠে' বল্‌লে—এই, খবর্‌দার! ও-গুলো খুলিস্‌নি, ও-গুলো আমার চিঠি।

কিন্তু তখন খোলা দূরের কথা, পড়া স্বরু হ'য়ে গিয়েছে। যূঁই চীৎকার ক'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো—ওগো আমার অন্ধকারের আলো, জীবন-মরুর ওয়েসিস্‌, চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তুমি যে অমৃত পরিবেশন করেছ, তারি স্পর্শে আমার মন মাতাল হ'য়ে উঠেছে। তোমার চোখ্‌, সেতো কেবল চোখ্‌ নয়, সে যে বিপুল—কূলহারা সমুদ্রের মতো অসীম সৌন্দর্য্যের রহস্যাগার। সে যে মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—কোন্‌ অতলের অভিমুখে, সে যে চিত্তকে ভুলিয়ে নে যায়—অসীম সৌন্দর্য্যের মাঝ্‌খানে। তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকো, আমার মনে হয়, আমার জীবন-সমুদ্রের দিগ্বিদিক্‌ ভাসিয়ে দিয়ে প্রেমের চন্দ্র নেমে এসেছে এই ধরণীর বুকে—ঐ জানালার ফাঁক্‌টাতে। কিন্তু তুমি কি চিরদিনই আমার কাছে দুর্লভ হ'য়েই

থাক্‌বে ? কোনো দিনই কি আমি পাবো না তোমাকে কাছে—অতি কাছে—আমার এই বুকের মাঝ্‌খানটাতে ! হে আমার চির-রহস্যময়ী মানস-প্রতিমা—চোখ্‌ যদি চোখের স্পর্শ পেয়েছে, দেহটাই কি চিরকাল কাঙাল হ'য়ে থাক্‌বে......

এই পর্য্যন্ত পড়া হ'তেই রাধারাণীর বাবু হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠে' বল্‌লে—এতক্ষণে বুঝেছি রাণী, কেন আজ তুমি এত খুসী হ'য়ে উঠেছ। ভাই সব, আজ তোমরা কাঁদো ! আমার সঙ্গে শোক করো—কাল আর রাধারাণী আমার থাক্‌বে না। যে এই চিঠি লিখেছে—

রাধারাণী হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বল্‌লে,—আরে না—না ! ও সেই অরুণের চিঠি, যার সঙ্গে আমি প্রথম ঘর ছেড়ে এ-পথে পা বাড়িয়েছিলুম ! ও ছোঁড়াতো কবে বিদেয় নিয়েছে, তবেই না তুই আমাকে পেয়েছিস্‌। নে, আর এক গ্লাস ঢাল্‌।

তারপর সেই সুরার গেলাসটা ঠোঁটের আগে তুলে' ধর্‌তে ধর্‌তে রাধারাণী বল্‌লে—কিন্তু আমি ঠিক করেছি, আর না—আর না—এ পথে আর না !......

রিক্তা

রিক্তা
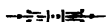
আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর আকাশ সারা রাত ধ'রে ধারা-যন্ত্রটাকে চালিয়ে চালিয়ে ভোরের দিকে একটু ঝিমিয়ে পড়্তেই, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর টুক্রোগুলো সদ্য-জাগরিত ধরিত্রীর বুকের উপর নেমে পড়্লো। সাবিত্রী অনেকক্ষণ আগেই বিছানার মায়া পরিত্যাগ ক'রে উঠে' প'ড়েছিল। এইবার সে ঘরে ঢুকে' জানালাগুলো খুলে' দিতেই, বিছানার ভিতর হ'তে প্রতিভা ডাকলে —দিদি!

—কি ভাই!

—বাইরে বেশ রোদ উঠেছে, না?

—হ্যাঁ, এই যে ঘর একেবারে রোদে রোদে ভ'রে গেছে।

—ভোরের রোদ খুব মিষ্টি, চোখে না দেখ্‌লেও তার স্পর্শে তাকে বোঝা যায়।

সাবিত্রী উত্তর দিল—যে জিনিষটা সত্য, তার স্বভাবই এই ; তাকে চোখে ধরা না গেলেও স্পর্শে ধরা যায় ; আর স্পর্শে ধরা না গেলেও মনের ভিতর তার ছাপ পড়ে।

—হৃদয়ে তো ভাই, অনেক জিনিষেরই ছাপ পড়ে। কিন্তু তাই ব'লে তার সবই যদি সত্য হ'তো, তবে......

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার ম্লান হাসিটা ঠিক কান্নার মতোই করুণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

সাবিত্রী দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—হৃদয়ে যার ছাপ পড়ে, আমার অনুরোধ, প্রতিভা, তাকে যাচাই করতে গিয়ে অনর্থক দুঃখের পাথার বাড়িয়ে তুলিস্‌নে। জানিস্‌, কোথাও না কোথাও তার ভিতর সত্য আছেই, আর তুই তাকে ধর্‌তে পার্‌ছিস্‌নে ব'লেই তা তোকে বেদনা দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখিস্‌, সত্যের চারদিক আগুনের বর্ম্ম দিয়ে ঘেরা ; সেই আগুনকে যারা সইতে পারে, সত্য কেবল তাদের কাছেই প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।

একটু থেমে সাবিত্রী আবার বল্‌লে—এ আমার মন-গড়া কথা নয় ভাই। সত্য যে কত বড় নির্ম্মম ও কত ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর, তার পরিচয় আমি নিজের ভিতর পেয়েছি ব'লেই আজ এ কথা তোকে বল্‌তে সাহস পাচ্ছি। কিন্তু তাও বলি, তুই তো ভাই, সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিস্, তোর এই ক্যাঙ্‌লাপনা কেন বল্ তো! তুই যে প্রভাতকে ভালোবাসিস্, তাতে তো এতটুকু ভুল নেই। আর তার প্রতিদানও তো তুই পেয়েছিস্।

প্রতিভা একটু করুণ হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ ভাই, অন্ধকে নাকি আবার কখনো ভালোবাসা যায়!—

যে প্রভাতের ভালোবাসা নিয়ে কথা হচ্ছে, সে প্রভাতকে সাবিত্রী বেশ ভালো ক'রেই জান্‌তো। প্রথম যৌবনে আপনাকে বিকিয়ে দেবার নেশায় তার মন যখন বিচঞ্চল তখনি একদিন তরুণ প্রভাতে এই প্রভাতকে ঘিরেই তার চিত্ত-বীণা হাজার ছন্দে ছন্দিত হ'য়ে উঠেছিল। প্রেমের পদ্মটি তার অন্তরের বৃন্ত ঘিরে' ফুটে' উঠ্‌লো। প্রেমের দেবতাকে সে তা দিয়ে পূজাও ক'রে গেলো। যে প্রভাত তার চারদিকে একেবারে শিকারীর মতো ফাঁদ পেতে ব'সেছিল, তার কাছে হৃদয়ের এই খুন-ঝরা আত্ম-নিবেদনের কথা যে গোপন ছিল, তাও নয়। কিন্তু তথাপি

যখন তার খুড়্‌তুতো বোন্ প্রতিভা এসে আসরে 'বার' দিতেই প্রভাত তারি গলায় বরণ-মাল্য ছুলিয়ে দিলে, তখন তা নিয়ে বাইরে সে কোনো রকমের জোর-জবরদস্তি জানালো না বটে, কিন্তু মনে মনে সে এ-কথাটাও না ব'লে পার্‌লে না যে,—তার টাট্‌কা তাজা শোণিতাক্ত হৃদয়কে দলিত, মথিত, পিষ্ট ক'রে যারা চ'লে গেল, তারাই কি সুখী হ'তে পার্‌বে ?

তার এই একান্ত বেদনার দ্বারা উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তির ভিতর হয়তো কোনো ইচ্ছাকৃত অভিশাপের ছাপ ছিল না, কিন্তু বিয়ের বছরখানেক পরেই প্রভাত বিলেতে ডাক্তারী পড়্‌তে গিয়ে যুদ্ধের পরেকার উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর যখন গা ভাসিয়ে দিলে, এবং তার পরেই কিছুদিন একটা কঠিন রোগ ভোগ ক'রে প্রতিভা অন্ধ হ'য়ে গেলো তখন সাবিত্রী নিজের বুকের বেদনার নিক্তিতে প্রতিভার দুঃখের মাত্রাটা ওজন কর্‌তে গিয়ে একেবারে শিউরে উঠ্‌লো। তার কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো, এ বুঝি তারি অভিশাপের ফল ;—তার মনের চারদিক ঘিরে যে'আগুনের শিখা সেদিন জ্ব'লে উঠেছিল, তাই বুঝি এ তরুণ-তরুণীর সুখের নীড়টাকে ভস্ম, ধ্বংস, বিধ্বস্ত ক'রে দিতে উদ্যত হয়েছে। নিজের

অসহিষ্ণুতা এবং অনুশোচনার বেদনায় সাবিত্রীর নারী-হৃদয় কান্নার দুর্ব্বহ অশ্রু-ভারে ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো। সে মনে মনে শপথ ক'রে বস্‌লো—যত দিন পর্য্যন্ত প্রভাতের মনের হাওয়া ঘুরে' না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত, পক্ষী-মাতা ঝড়ের রাতে যেমন ক'রে তার দুর্ব্বল অসহায় শিশুটিকে পক্ষ-পুট দিয়ে প্রাণপণে ঢেকে রাখে, তেম্‌নি ক'রে সে-ও সমস্ত দুঃখ হ'তে প্রতিভাকে আড়াল ক'রে রাখ্‌বে—যেমন ক'রেই হোক্‌—যেমন ক'রেই হোক্‌।

সুতরাং প্রতিভা যখন বল্‌লে, হ্যাঁ ভাই, অন্ধকে নাকি আবার ভালোবাসা যায়, সাবিত্রীর মুখ একেবারে ব্যথার বেদনায় ম্লান হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তবু সে কণ্ঠস্বরের ভিতর হাসির একটু সুর টেনে এনে বল্‌লে,—শোন্‌ একবার কথা! ভালোবাসা নাকি অন্ধ কানা কালা খোঁড়ার কিছু বাছ-বিচার করে! ইংরেজী সাহিত্যে এই জন্যেই প্রেমের দেবতাকে অন্ধ ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। এই দেবতাটি যাকে একবার অনুগ্রহ করেন, তার নাকি আর পরিত্রাণ আছে! আচ্ছা, প্রভাতের ভালোবাসার পরিচয় কি এখনো তুই পাস্‌নি? এই যে সেদিন সে তোকে চিঠি লিখেছে—আমিই তো প'ড়ে শোনালুম,—কি মমতা, কি বেদনা, কি ভালোবাসা জড়ানো রয়েছে তার ছত্রে ছত্রে!

প্রতিভার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি বালিশের তলাটা একবার একান্ত আগ্রহে হাত্‌ড়িয়ে নিলে। সেখানে লুকানো প্রভাতের চিঠির স্পর্শ তাকে ঠিক প্রভাতের স্পর্শের মতো ক'রেই পুলকিত ক'রে তুল্‌লো।

সাবিত্রী সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—হায় পুরুষ, প্রেম তোমাদের কাছে কেবল খেলার জিনিষ। কিন্তু নারীর কাছে সে তো খেলার জিনিষ নয়,—সে যে তার দেহ, মন, হৃদয়,—তার যথা-সর্ব্বস্ব। নিজের বুকের ভিতরের দিকেও তাকিয়ে সে দেখ্‌লে।—সেখানে যে হাহাকার উঠেছে, তাতেও সে সেই কথারই সায় পেলে। তার হৃদয়ের হাহাকার কাকেও জানাবার নয়; কিন্তু তাই ব'লে তার ব্যথার ঝাঁঝ এতটুকুও কম ছিল না।

*
* *

সেদিন 'মেল-ডে'—বিলেতের চিঠি আস্‌বার দিন। জানালার ধারে ব'সে প্রতিভা রাস্তার লোকের পায়ের শব্দগুলো গুণ্‌ছিল—একটির পরে একটি ক'রে। কই কেউ তো তাদের দোরের কড়া নাড়্‌ছে না! একবার সে চাকরটাকে ডেকে জেনে নিলে, ক'টা বেজেছে। তার-পর আবার সেই জানালায় তার প্রতীক্ষার পালা স্থরু হ'য়ে গেলো। খানিকক্ষণ পরে উদ্গত অশ্রু দমন কর্‌তে কর্‌তে সাবিত্রী ঘরে ঢুকে' বল্‌লে—তুই কিসের জন্তে অপেক্ষা কর্‌ছিস্ বল তো?

প্রতিভা বল্‌লে—অপেক্ষা আবার কিসের ? জান্‌লার ধারে বস্‌লে তবু মনে হয় যে আলোর স্পর্শ পাচ্ছি, কিন্তু ঘরের অন্ধকার যে আর আমার সহ্য হয় না। প্রতিভার চোখ্‌ সজল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওসব চালাকি আমি বুঝি। এই নে প্রভাতের চিঠি। কিসের জন্যে যে সকাল থেকে এখানে এসে বসা হয়েছে, তা বুঝি আর আমি বুঝিনে !

প্রতিভা সলজ্জ দীপ্ত মুখে বল্‌লে—কিন্তু দিদি, কই, পিয়নের আসার শব্দ তো আমি পেলুম না।

—শব্দ পাবি কোথেকে ? সকালে উঠেই আমি যে পরেশকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম পোষ্ট-আফিসে। তোর যে আর সবুর সইছে না, সে তো আমি জানিই।

প্রতিভা একান্ত কৃতজ্ঞতা-ভরা চোখ্‌-দু'টি তুলে' চিঠিখানা একবার হাতের ভিতর টেনে নিয়ে তখনি ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—দিদি পড়্‌বিনে ?

সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর কুণ্ঠায় এবং বেদনায় ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো, তথাপি সে জোর ক'রে তা হাল্‌কা ক'রে নিয়ে দীপ্ত সুরে পড়্‌তে সুরু কর্‌লে—

আমার দৃষ্টিহীনা প্রিয়তমা,—লণ্ডনের নীল আকাশ

ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকায় ভ'রে কালো হ'য়ে গেছে। তার এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমার অন্ধ প্রিয়তমার তনু-দেহের স্পর্শটুকু দুল্‌চে—বাতাস সমুদ্রের বুকে যেমন ক'রে দোলা খেয়ে বেড়ায়, তেম্‌নি ক'রে। লণ্ডনের অন্ধ প্রকৃতি আজ আমায় তোমাকে আবার নতুন রূপে মনে পড়িয়ে দিলে।

আলোর জন্যে মানুষের মন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে কেন—আমি আজ তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে। এই গাঢ় ঘন নিবিড় অন্ধকার—এই আকাশ-পাতাল-স্বর্গ এক-ক'রে দেওয়া আনন্দ, এর চাইতে কি আলোকের মাপা—নিঃশেষে সবটুকু-ফুটিয়ে-তোলা আনন্দ ভালো? যারা ভালো বলে, তারা অন্ধকারের রূপ দেখেনি। ওগো আমার অন্ধকারের প্রতিমা, অন্ধকারের ভিতরেই যে আমি তোমাকে নিত্য নতুন মূর্ত্তিতে লাভ করি। সুতরাং তোমার চোখে যে দৃষ্টি নেই, তার দুঃখ আমাকে এতটুকু আঘাত কর্‌তে পারেনি।

আমার প্রতিভার চোখের উপর অন্ধত্বের নীল মেঘ যে অন্ধকারের কাজল টেনে দিয়েছে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার স্মৃতির বিদ্যুৎ তারি উপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা রেখা লিখে চলেছে। সেখানে আর কেউ নেই—

আর কিছুই নেই। একজনের মনের উপর এম্‌নি ক'রে দাবীর অধিকার স্থায়ী ক'রে নেওয়া—তার আনন্দে আমার মন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

প্রিয়া, তোমার চোখ্ যদি আজ অকস্মাৎ দৃষ্টি হারিয়ে না ফেল্‌তো, তবে একান্ত আমার একেলার এই অপূর্ব্ব হৃদয়টি আমি কোথায় পেতুম? দুনিয়ার অজস্র সৌন্দর্য্যের ভিতর সে হয়তো মাঝে মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌তো—বিশ্বের বিক্ষিপ্ত বিপুল আকর্ষণে হয়তো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তো। এই ধ্যান-বিহ্বল চিত্তটি—এ-তো এমন ক'রে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমাকে বরণ ক'রে নিতো না। তোমার অন্ধত্ব আমার কোনো ক্ষতি করেনি; বরং আমার মতো কাঙালকে আশাতীত সম্পদের অকুণ্ঠিত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছে।

হয়তো তুমি আমাকে স্বার্থপর ব'লে মনে করছ। স্বার্থশূন্য প্রেম কবির কল্পনায় হয়তো থাকৃতে পারে, কিন্তু দুনিয়ায় কোথাও তার অস্তিত্ব আছে কি না, জানি না। কিন্তু ওগো আমার মানস-লোকের ধ্যানের দেবতা, আমার প্রেম স্বার্থপর হ'লেও তা আমাকে সার্থক ক'রে তুলেছে, নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার গৌরব হ'তেও সে আমাকে বঞ্চিত করেনি। এই চোখে আমার যে

রিক্তা

আলোর ধারার বিপুল প্লাবন জেগে আছে, সেই আলো দিয়ে আমি তোমার অন্ধকার ভরিয়ে তোল্‌বো। জগতের যে শোভা, যে সৌন্দর্য্য হ'তে তুমি বঞ্চিত হয়েছ, তোমার জন্যই সে শোভা, সে সৌন্দর্য্যকে আমার চোখের পাতায় পাতায় ভ'রে নিতে হবে। তার পর আমার স্পর্শের ভিতর দিয়ে, আমার ভাষার ভিতর দিয়ে, আমার ব্যথা-বেদনা-আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে তা তোমারই দেহের অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত হবে, তোমার নিথর-নিবিড় অন্ধকারকে অন্তর্লোকের আলোর ধারায় উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌বে। নিজের চোখে-দেখা আলোর চাইতে প্রিয়তমের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে এই যে আলোর স্পর্শ, এর আনন্দ—এর গৌরব ঢের বেশী—ওগো ঢের বেশী।

মহাভারতের গান্ধারীর ত্যাগ আমাদের মনের উপর একটা বড় রকমের গৌরবের আসন অধিকার ক'রে বসেছে। গৌরবের যে কিছু নেই তার ভিতরে, তা আমি বল্‌ছিনে; কিন্তু আমি জানি, আমার সাধনা তার চাইতেও বড়।

আমার সাধনা আপনাকে বঞ্চিত করবার সাধনা নয়—আমার সাধনা অন্ধ প্রিয়তমার চোখের ভিতর দৃষ্টির আলো ফিরিয়ে আন্‌বার সাধনা। প্রিয়তমের মৃত্যুর পর

যারা আত্মহত্যা করে, তারা যে কোনো সাধনাই করেনি তা নয়, তারা অন্ততঃ মরণ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু তার সাধনাই বড়, যে বেহুলার মত মৃত পতির দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আন্‌তে পারে। ওগো আমার অন্ধকারের রাণী, আমার এই চোখের আলো দিয়েই আমি তোমার অন্ধ চোখে দৃষ্টির আলো ফিরিয়ে আন্‌বো, আমার ভিতর দিয়েই তুমি তরুণী ধরণীর অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলার আনন্দ অনুভব করবে।

আজ এই লণ্ডনের অন্ধকার আমার মুখের উপর তোমার অন্ধকার ছু'টি চোখের মতোই তাকিয়ে আছে। আর সেই অন্ধকারকে আলো ক'রে জেগে আছে আদিম উষার প্রথম পদ্মটির মতো দলের পর দল মেলে অসীম রহস্যের অপূর্ব্বতায় ঘেরা তোমারি ঐ অপরূপ মুখ-পদ্মটি। আমার মন কাঁপ্‌ছে, দেহ টল্‌ছে, রক্ত-কণিকার ভিতর ঢেউয়ের মাতন সুরু হয়েছে। আমার প্রিয়া—আমার প্রিয়তমা!······

চিঠির সুরে প্রতিভার রক্তের কণাগুলোর ভিতরেও ঢেউয়ের মাতন সুরু হ'য়ে গেলো। সে ছু'হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধ'রে মূর্চ্ছাহতের মতো চুপ ক'রে খানিকক্ষণ

প'ড়ে রইলো ; তার পর অশ্রু-ভেজা স্বরে সাবিত্রীকে ডাক্‌লে—দিদি !

—কেন ভাই !

—এই অন্ধ আতুরকে তিনি কেন এতো ভালো-বাস্‌লেন ? এর স্রোত যে দুকূল ছাপিয়ে ছুটে' চলেছে—এর বেগ তো সইবার শক্তি আমার হবে না।

—ভালোবাসা তো কোনো দিনই তীরের তলে তলে বইতে পারে না, সে তো চিরদিনই কূল ছাপিয়ে চলে, বোন্‌ !

—কিন্তু তুমি হয়তো লক্ষ্য ক'রে দেখনি, এ-চিঠি-গুলোর সঙ্গে আমার চোখ্‌ থাক্‌তে যে চিঠিগুলো পেয়েছি, তার কত তফাৎ। বিলেত যাবার পর-পরই যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন, তাতে বরং এই ধরণের একটা আবেগের উচ্ছ্বাস ছিল—কিন্তু……

—সে তো কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় প্রতিভা, পড়া-শুনার চাপ যে তখন তার মাথার উপর আষাঢ়ের মেঘের মতোই ভেঙে পড়েছিল !

—আমিও তাই বল্‌তুম্‌, কিন্তু তোমরাই তাঁকে সন্দেহ ক'রে বলেছ, তিনি বিগ্‌ড়ে গেছেন—উচ্ছন্ন গেছেন—এমনি কত কি !

—ভুল করেছিলুম ভাই, ভুল করেছিলুম! তোর প্রেমের গাঢ়তা কি আমি তখন জান্‌তুম! জান্‌লে তোর ঐ উদ্বেলিত হৃদয়কে আঘাত কর্‌তে কখনো সাহস কর্‌তুম না।

দুই চোখ্‌ ছাপিয়ে উদ্গত অশ্রুর ধারা সাবিত্রীর গণ্ড ভাসিয়ে দিয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে তার বুকের কাপড়ের উপর ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো। দু'হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত হৃদয়টা চেপে ধ'রে সে মনে মনে বল্‌লে—হায়রে হতভাগী!

*
* *

সেদিন দুপুর না যেতেই বর্ষার মাতন সুরু হ'য়ে গেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের চোখ্-ঝল্‌সানো দিনের দীপ্তির উপর আষাঢ়ের মেঘের সজল স্নিগ্ধচ্ছায়া কালো কাজলের প্রলেপের মতো ছড়িয়ে পড়েছে—একটা অপূর্ব্ব মায়া-লোকের সৃষ্টি ক'রে।

বারি ঝর্‌ছে—ঝর্ ঝর্ ঝর্। এই অফুরন্ত ঝরার গান তরুণী ধরার বুকের উপর বীণার ঝঙ্কার তুলে' যেন কাঁপ্‌ছিল। মিলনের ভিতর যে বিদ্যুৎ আছে, মেঘের সঙ্গে মেঘের আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে তারি

মায়া-মৃগ

ক্ষণিক বিকাশ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চকিত ক'রে তুল্‌ছিল। পথের প্রান্তে জন-কোলাহলের অশ্রান্ত প্রবাহ থেমে গেছে। বিরহের একটা অফুরন্ত স্বপ্নের মাঝ্‌খানে পৃথিবী যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, একান্ত অসহায় নীড়হারা পক্ষী-শাবকটির মতো।

বাদল দিনের এই মায়ালোকের ভিতর অভিসারিকার মন নিয়ে প্রতিভা জানালার ধারে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ছিল। মেঘের মায়ার স্নিগ্ধ-সজল আভা সে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তার তুলির স্পর্শ সে সর্ব্বদেহেই অনুভব কর্‌ছিল। এমনি বাদলা দিনের কত মেঘ-ভার-নত সন্ধ্যায় প্রভাত আর সে মুখোমুখি হ'য়ে ঘরের কোণে ব'সে কত সুরের কান্নার সৃষ্টি করেছে। বর্ষার নীলাঞ্জন আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়্‌তেই ঘরের নিরালা কোণটিতে ব'সে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়া আর বর্ষার গান গাওয়াই ছিল তাদের দু'জনের কাজ। মানস-লোকের কেয়াফুলের রেণু এবং নবীন নীপের গন্ধ এই দু'টি তরুণ-তরুণীর মনকে নাড়া দিয়ে তখনকার দিনে যেমন ক'রে আকুল ক'রে তুল্‌তো, প্রতিভা মনের পুঁথির পাতার পর পাতা উল্‌টিয়ে তারি লেখাগুলি প'ড়ে নিচ্ছিল। তার মনে হ'লো, মেঘের সুরের সঙ্গে সুর

রিক্তা

মিলিয়ে প্রভাত মাতাল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাইছে—

"শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায় যে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।"

ঐ তার গলা পর্দ্দার পর পর্দ্দা তুলে' গান ছেড়ে আবৃত্তির সুরে বুঝি হাঁকলে—

"ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন-গৌরবা নব-যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে ;
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

হঠাৎ বর্ষার সুরের ঝঞ্জনা থেমে গিয়ে বুঝি সুরু হ'লো মেঘের অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে বিরহী বিশ্ব-প্রকৃতির অশ্রু-ঝরা ব্যথার গোঙ্‌রানি—

"এ সখি হামার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—
শূন্য মন্দির মোর।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

সত্যই তো তার 'ছাতিয়া' ফেটে যাচ্ছে, চারিপাশের নিবিড় ঘন অফুরন্ত অন্ধকারের মাঝ্খানে। হায় রে অন্ধ, মিলনের দিনে যে জিনিষগুলো মিলনকে নিবিড়তর মধুরতর ক'রে তুলেছিল, আজ বিরহের দিনে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখ্বার অধিকারটুকুও তার নেই!

এমনি ক'রে জীবনের পেছনের পাতাগুলি প্রতিভা উল্‌টে উল্‌টে দেখ্ছিল। সাবিত্রী ঘরে ঢুকে'ই তার জল-ভরা দৃষ্টিহীন চোখ্ দু'টোর দিকে তাকিয়ে জোর ক'রে একটু হেসে ব'লে উঠ্‌লো—প্রতিভা-রাণীর আজ বুঝি দেয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জল-ঝরার 'রিহার্সেল' চল্‌ছে?

—না ভাই, দিদি, কেন জানিনে আজ মিছিমিছি......

—মিছিমিছি নয় ভাই, বাদ্‌লার সন্ধ্যায় আজ বুঝি রৌদ্র-দীপ্ত দিনের প্রভাতকে মনে পড়েছে। কখন্ যে

তোর তাকে মনে পড়ে, আর কখন্ যে পড়ে না, তাতো জানি না।

প্রতিভা ম্লান হেসে বল্‌লো—মনে পড়্‌বার না-পড়্‌বার মালিক কি আমি! কেন তিনি বিদেশে প'ড়ে থাকেন—কিসের অভাবে শুনি! কিন্তু সে কথা থাক্ দিদি, আমাকে গোটা দুই বর্ষার কবিতা প'ড়ে শোনা—এইখান্‌টাতে ব'সে ঠিক তেম্‌নি স্বরে, যেমন ক'রে তিনি পড়্‌তেন। কি আশ্চর্য্য ভাই তোর গলার স্বর অনুকরণ কর্‌বার ক্ষমতা! তোর পড়া শুনে' মনে হয়, তাঁরি স্বরের মূর্চ্ছনা বাতাসে ঘুরে' বেড়াচ্ছে!

সাবিত্রী রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থখানি টেনে নিয়ে পড়্‌তে সুরু কর্‌লে। তার স্বর কোথাও অশ্রুতে ভিজে', কোথাও আনন্দে উছ্‌লে উঠে', কোথাও ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে মন্দ্রিত হ'য়ে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো। সে স্বর কখনো থেমে, কখনো কেঁপে, কখনো দীর্ঘায়ত মেঘের ডাকের মতো ছন্দের পর ছন্দ টেনে চলেছে। দু'একটা কবিতা প্রতিভা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেও। কিন্তু তার পরেই আর তার শোন্‌বার দিকে মন রইলো না। সাবিত্রীর স্বর এসে তার কানে বাজ্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু সে যে কোথায় কত দূর হ'তে ভেসে আস্‌ছে, সে এ-পারের

কি ও-পারের তট-প্রান্তের গান, যে পড়্ছে তার হৃদয়ের কোন্ নাড়ীটির কতটা রক্ত নিংড়ে তার উচ্চারণ দানা বেঁধে উঠছে, সে সব প্রতিভার বিমুখ বিহ্বল মনের তারে কোনো রকমের ঘা দিতে পার্‌লে না। পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ এক সময়ে সাবিত্রী প্রতিভার নিঃসাড় মুখের দিকে তাকিয়ে একটা লাইনের মাঝ্‌খানে থেমে পড়্‌লো, তার পরেই লজ্জিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো,—তোর বুঝি ভালো লাগ্‌ছে না প্রতিভা?

অকস্মাৎ কোনো একটা অন্যায়ের মাঝ্‌খানে ধরা প'ড়ে গেলে মানুষের মন যেমন লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়ে, সাবিত্রীর কথায় প্রতিভার মুখ তেম্‌নি ক'রে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। ব্যথিত করুণ কণ্ঠে সে বল্‌লে—হ্যাঁ ভাই, একটা লোক আর একজনের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়, নিজের বল্‌তে কিছুই রেখে যায় না, এ জোর মানুষ কোথা হ'তে পায় বল্‌তে পারিস্? এই দেখ্, তোর মত ক'রে কবিতা পড়্‌তে আর কেউ পারে কি না জানি না, কিন্তু তবু তোর কবিতার ভিতর মন বসাতে পার্‌লুম না—আমার মন ডুবে' গেলো তাঁরি পড়ার বিশেষ ভঙ্গীগুলোর ভিতরে। কবে কোন্ লাইনটার উপরে তিনি কেমন ক'রে জোর দিয়েছিলেন, কোন্ কথাটার উচ্চারণ

তিনি কোন্ বিশেষ ভঙ্গীতে করতেন, এই সব কথা ভাবতে ভাবতে অমন চমৎকার কবিতাগুলো আমার কাছে একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো। অত দূরে দূরে থেকেও মানুষ মানুষকে এমন প্রবল বেগে কি করে যে টানে......

সাবিত্রী হাস্‌বার ভান ক'রে বল্‌লো—শোন্ কথা,— এ অবস্থা নাকি একা ওরই নতুন! চাঁদ ওঠে ঐ আকাশে, কিন্তু প্লাবন জাগে লাখো যোজন দূরের সমুদ্রটাতে। মনের সমুদ্রের উপর জ্যোৎস্না যখন পড়ে, সে এমনি ক'রেই কূল ছাপিয়ে ওঠে। প্রভাতের উপর তোর যে ভালোবাসা, সে তো ঐ সমুদ্রের মতোই। দূরের কাছের কথাটার সুতরাং কোনো দামই নেই।

সাবিত্রী চুপ কর্‌লো। তার অন্তরের দুকূল ছাপিয়ে যে রোদন জেগে উঠ্‌লো, তার আভাসটাও সে প্রতিভাকে জান্‌তে দিলে না। সমুদ্রকে কেবল মাত্র জ্যোৎস্নাই যে নাচিয়ে তোলে না, মেঘও যে তাকে নাচিয়ে ক্ষেপিয়ে মাতাল ক'রে তোলে, সে কথাটা কতবার কত রকম ক'রে বল্‌বার সুযোগ এসেছে সাবিত্রীর, কিন্তু মেঘের ভিতরকার এই পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎকে জ্যোৎস্নার আড়ালে লোপ ক'রে দেওয়ার সাধনাই যে ছিল তার সাধনা। সুতরাং তা নিয়ে নালিশ বা অভিযোগ কর্‌বার মতো

মনের অবস্থা তার ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সাবিত্রী আবার ব'লে উঠ্‌লো—জানিস্ প্রতিভা, নরেন কি লিখেছে প্রভাতের সম্বন্ধে ?

উৎসুক ব্যগ্র অন্ধ চোখের দৃষ্টিহীন তারা দু'টি সাবিত্রীর মুখের দিকে ফিরিয়ে তুলে' ধর্‌তেই সাবিত্রী হেসে বল্‌লে—ওরে ভয় নেই, তোর ভয় নেই, আমি কোনো দুঃসংবাদ দিচ্ছিনে। নরেন যা লিখেছে শোন্, তার চিঠি থেকেই আমি তোকে প'ড়ে শোনাচ্ছি। সে লিখ্‌ছে—জানো সাবিত্রীদি,—প্রভাত আবার জার্ম্মাণীতে চল্‌লো সেখানে কে না-কি একজন ডাক্তার চোখের চিকিৎসা সম্বন্ধে কি একটা নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন, তাই আয়ত্ত ক'রে আন্‌বার জন্যে। চোখের চিকিৎসা নিয়ে প্রভাত যা কর্‌ছে তা একেবারে অদ্ভুত। এমনভাবে এই চিকিৎসা-শাস্ত্রটার উপরে সে ঝোঁক্ দিয়েছে যে, সেকালের মহাবিলাসী প্রভাত বিলাসের কথা তো ভুলেইছে, স্নানাহারের কথাও তার মনে থাকে না। তার শুষ্ক রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে আমি তাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—হঠাৎ এ ধরণের জানোয়ার সাজ্‌বার রোখ্ তার চাপ্‌লো কেন ?—সে তাতে উত্তর দিলে,—জানোয়ার সাজ্‌লে কাজের ঢের

সময় পাওয়া যায়; কেবল চেহারায় নয়, প্রকৃতিতেও জানোয়ার সাজ্‌বার চেষ্টায় আছি, তোমাদের মতো বন্ধু-বান্ধবদের হাত হ'তে মুক্তি-লাভের জন্যে। আমার ঢের সময় নষ্ট করেছ ভাই, এখন ওঠো,—এই Experimentটা আমাকে এই বেলাতেই শেষ কর্‌তে হবে। এই রূঢ় কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে শেষ ক'রে থাম্‌তেই দেখি, তার চোখের কোণে জলের রেখা চক্‌-চক্‌ কর্‌ছে। আর কেউ হ'লে তার ব্যথা না বুঝে' হয়তো তার উপরে রাগ কর্‌তো; কিন্তু আমি তার বেদনায় চোখের কোলে এক কলস জল ভ'রে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।......

প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—তোমার পায়ে পড়ি সাবিত্রী-দি', তুমি তাঁকে বাড়ী ফিরে আস্‌তে লিখে দাও। আমার জন্যে কেন তিনি এমন ক'রে দুঃখ সহ্য কর্‌বেন? তাঁর শরীর তো কোনো দিনই দুঃখ সইবার মতো সবল ছিল না। বিদেশ-বিভুঁয়ে এই অন্ধের জন্যে তিনি যদি কোনো কঠিন রোগে পড়েন......

—আমি লিখ্‌লেই কি ভাই, প্রভাত ফিরে আস্‌বে? সে যে তোকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার জন্যেই তপস্যা কর্‌ছে। তুই কি ভাব্‌ছিস তাকে ফিরে আস্‌বার জন্যে কেউ অনুরোধ করেনি? অনুরোধ অনেকেই

করেছে, কিন্তু সে তার উত্তরে কি বলেছে জানিস্ ?—সে বলেছে—ভালোবাসার জন্যে তপস্যা করার দৃষ্টান্ত তো আমাদের দেশে বিরল নয়। এই তপস্যা ক'রেই তো সাবিত্রী সত্যবানকে জীবন দিয়েছিল, বেহুলা মৃত পতিকে মৃত্যু-পুরীর দ্বার হ'তে ফিরিয়ে এনেছিল। তারা যদি মৃতের দেহে প্রাণ-সঞ্চার কর্‌তে পেরে থাকে, আমি কি আমার প্রতিভার চোখে দৃষ্টিটাও ফিরিয়ে দিতে পার্‌বো না? প্রেমের জন্যে তপস্যা কি কেবল নারীরাই কর্‌বে—ভালোবাসার জন্যে প্রাণপাত কর্‌বার অধিকার কি পুরুষদের নেই? পুরুষ তার স্বার্থপরতা দিয়ে প্রেমের দেবতার কাছে যুগ যুগ ধ'রে যে অপরাধ জমিয়ে তুলেছে,—আমি তো তারি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি।

আনন্দে এবং বেদনায় প্রতিভার চোখের পাতায় জলের ধারাগুলো উছ্‌লে উঠে' গণ্ড গড়িয়ে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো। আর সাবিত্রী সেই ঝর্ণার ধারার দিকে তাকিয়ে কি যে ভাব্‌তে লাগ্‌লো সেই জানে!

*
* *

সেদিন কি একটা কাজে সাবিত্রী বাড়ীতে নেই। প্রতিভা জানালার ধারে তার দৃষ্টিহীন আঁখি দু'টি বাইরের পানে মেলে দিয়ে নিত্যিকার মতোই ব'সে ছিল। হঠাৎ তার সাম্‌নে এসেই পিয়ন হাঁক্‌লে—মায়ি চিট্‌ঠি।

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিতেই তার মনে হ'ল, এ হয়তো বিলেতের ডাক। একটা আগ্রহ-ভরা আনন্দে তার অন্তর্লোকের মাঝ্‌খানটায় দোলা দিতে সুরু ক'রে দিলে।

মায়া-মৃগ

চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে প্রথমটায় বুকের ভিতর চেপে ধর্‌লো, তার পর লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠে' মৃদু কণ্ঠে হাঁকলে—দিদি!

সাবিত্রীর পরিবর্ত্তে তার ছোট ভাই মণ্টু এসে বল্‌লে—দিদি ডাক্‌ছ?

—সাবিত্রীদি'কে একবার পাঠিয়ে দে না লক্ষ্মী-ভাইটি।

মণ্টু তার দিদির কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আব্‌দারের সুরে বল্‌লে—তোমার কি কাজ বলো না দিদি-ভাই, আমিই ক'রে দিচ্ছি। সাবিত্রীদি' সেই ভোরে উঠে' কোথায় গেছেন, ব'লে গেছেন, তাঁর ফির্‌তে দেরী হবে।

—হাঁরে মণ্টু, তুই বুঝি হাতের লেখা পড়্‌তে পারিস্‌নে। এত বড় হ'লি তবু......

দশ-এগারো বছরের বালকের বিদ্যার উপর এই সন্দেহের বাণ হান্‌তেই সে একেবারে খাপ্পা হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—দিদি, তুমি কিচ্ছু জানো না, আমি ছাপার লেখা, হাতের লেখা সব পড়্‌তে পারি। বিশ্বাস না করো......

প্রতিভা হাতের চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বল্‌লে—পারিস্‌ তো বল্‌ দেখি এখানা কার চিঠি?

চিঠির দিকে চোখ্ ফিরিয়েই মণ্টু লজ্জায় ম্লান হ'য়ে বল্‌লে,—ও যে ইংরিজীতে লেখা, আমি তো ইংরিজী পড়্‌তে পারি না দিদি-ভাই !

ভাইকে আদরে কোলের উপর টেনে নিয়ে প্রতিভা বল্‌লে—আচ্ছা, চিঠিখানা খুলে' ফেলে দেখ্, হয়তো ওর ভিতরে বাংলা লেখাও আছে।

মণ্টু তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে পত্রখানা খুলে'ই চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—হ্যাঁ দিদি, এ যে বাংলাতেই লেখা—এ আমি নিশ্চয় পড়্‌তে পার্‌বো—রোসো—এ চিঠি হচ্ছে সাবিত্রী দিদির, আর লিখেছেন প্রভাতবাবু !—পড়্‌বো ?

প্রতিভার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা আনন্দের উত্তেজনায় দপ্-দপ্ কর্‌তে লাগ্‌লো। কেবল মাত্র একটুখানি ন'ড়ে ব'সে সে মণ্টুকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—পড়্।

মণ্টু পড়্‌তে লাগ্‌লো—

সাবিত্রী,

তোমার সাবিত্রী নামটা আজ ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছে ; মনটাও মশ্‌গুল হ'য়ে আছে। তোমার চিঠির জবাব দেবার ঝোক্ তাই যখন আজ আমাকে পেয়ে বস্‌লো,

তখন আর তাকে সাম্‌লে রাখ্‌বার প্রয়োজন বোধ কর্‌ছিনে।

জীবন-সমুদ্রে কি ঢেউ উঠেছে এখানে, তা যদি দেখ্‌তে—উচ্ছল, চঞ্চল, ফেনিল, আনন্দের আবেশে ভরপূর। বাংলার বৈচিত্র্যহীন জীবনের সঙ্গে এর কোনো-খানে কোনো মিল নেই। তোমাদের ধাতে এ জীবন সইবে না জানি—তোমরা হয়তো একে বল্‌বে উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু ও-তো কেবল দুর্ব্বলের বাঁধা গৎ। যারা জীবনকে ভোগ কর্‌তে জানে না, অন্তরাত্মাকে উপবাসী রেখে হত্যা করেছে, তারাই জীবনের এই উদ্দাম সম্ভোগকে ঘৃণা করে।

স্রোতের মত জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে হাস্যে-লাস্যে, গানে-গল্পে, তাসের আসরে আড্ডা জমিয়ে, আর পেগের পর পেগ উড়িয়ে। বিলাসেরও একটা উদ্দাম রূপ আছে। সেই রূপ আমি আকণ্ঠ ভ'রে পান কর্‌ছি—জীবনটাকে দু'টো মুঠোর ভিতর পূরে' নিয়ে যদৃচ্ছা ছড়িয়ে দিচ্ছি। চারপাশে আমার ফুলের মেলা ব'সে গেছে। এই সব রক্ত-মাংসের ফুলের হাসি কুড়িয়ে নিয়ে আমার ধন-ভাণ্ডারে যে রত্ন জ'মে উঠেছে, তোমা-দের নাকি-কান্নার ঝুটো মুক্তো তা কি আমাকে কখনো কোনো কালে দিতে পার্‌তো ?

রিক্তা

অনেকগুলো চিঠি তুমি আমাকে লিখেছ—জবাব দিইনি, জবাব দেবার ফুর্‌সুৎ পাইনি। প্রতিভার কথা ভাব্‌ছিনে, তোমার প্রত্যেক চিঠি আমার কাছে কেবল এই একই অনুযোগের ফিরিস্তি খুলে' ব'সে আছে। কে প্রতিভা—কেন তার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবো? আমার জীবনের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের সঙ্গে তার কোথাও কোনো যোগ আছে কি? মানুষ চিনে-মাটির পুতুল নিয়ে খেলা করে; তার পর ভেঙে গেলে সেটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। প্রতিভা এক দিন আমার পথে এসে পড়েছিল, দু'দণ্ড তাকে নিয়ে হাসি-খেলার মাতামাতিতে কেটে গেছে—বাস্‌! সেইখানেই তো যবনিকা প'ড়ে গেছে—আবার কেন?

পথে এমনি কত জনের সঙ্গে তো দেখা হ'লো—তারা হীরের টুক্‌রোর মতো হাসির ঝর্‌ণা ঝরিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌লে, আমি তাদের অধরে পান-পাত্র পূর্ণ ক'রে ভোগের সুরা তুলে' ধর্‌লুম। মন বাঁধা পড়্‌লো—দেহ এলিয়ে গেলো, কিন্তু সেতো দু'দিন—তার পরেই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতোই তো তারা খ'সে পড়্‌ছে আমার পথের প্রান্ত থেকে। কই, তাদের কেউ তো অভিযোগের খাতা খুলে ব'সে নেই।

মায়া-মৃগ

তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্র কানা-ফুলওয়ালী রজনীকে নিয়ে অনেক কাণ্ড করেছিলেন। হয়তো তারি 'প্লটটা' তোমার মাথার ভিতর ঘোরালো হ'য়ে ঘুর্‌ছে। কিন্তু মনে রেখো গল্প—গল্প। বাস্তব-জীবনের অফুরন্ত বস্তু-সম্ভোগের ভিতর অসম্ভব উচ্ছ্বাসের কোনো দামই নেই। প্রতিভা দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়েছে, তার জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ করা ছাড়া আমার দ্বারা তার তো আর কোনো উপকারই হ'তে পারে না।

কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, তুমি চিঠির ভিতর তোমার নিজের কথা একেবারে গোপন ক'রে রেখেছ কেন? আমি তো জানি, তোমাদের পুষ্প-ধন্বা দেবতাটি আমাকে উপলক্ষ ক'রেই তোমার বুকেও এক দিন তাঁর তীক্ষ্ণ শায়কটি অব্যর্থ হাতেই সন্ধান করেছিলেন। তোমার মুখের গ্রাসটি আচম্‌কা এসে নিজের অজ্ঞাতসারে কেড়ে নিলেও প্রতিভার উপর সেদিন যে তুমি খুসী হ'য়ে ওঠোনি, তার প্রমাণ আমি অনেকবার অনেক রকমে পেয়েছি। ভয় ও পরাজয়ের খোঁচা সেদিন মনের দোরে মাথা উঁচিয়ে ছিল ব'লে আমি সাফ্ সে সব কথা চেপে গেছ্‌লুম। তুমি যে কেন চুপ ক'রে ছিলে, তা তুমিই বল্‌তে পারো। হয়তো নিশ্চিত পরাজয়ের বিরুদ্ধে

লড়াই করায় যে !নোই লাভ নেই মনে ক'রেই সেদিন তুমি রণে অগ্রসর হ'তে সাহস পাওনি। কিন্তু আজ তো আর সে আশঙ্কা নেই। আজ যদি প্রতিভার কথাটা না লিখে তোমার নিজের কথাটাই একটু বেশী ক'রে লিখ্‌তে, তবে এর চেয়ে ঢের বেশী খুসী হতুম। নেশাটাও তা হ'লে হয়তো আরো একটু জ'মে ওঠার অবকাশ পেতো।

তবে তাও ব'লে রাখ্‌চি, দুনিয়ার রূপ-ভাণ্ডারের কাছে যার মন বাঁধা পড়েছে, আজ লিলি, কাল নেলী, পরশু রীণী যার গলায় বাহুর মালা দুলিয়ে দিয়ে চ'লে যায়, তোমার নীল সমুদ্রের মতো ঐ দু'টো চোখও তার গলায় বন্ধনের শৃঙ্খল জড়িয়ে দিতে পার্‌তো না।

ভেবেছিলুম দু'লাইনে চিঠিখানা শেষ কর্‌বো। কিন্তু মাতালের অত্যুক্তি দেখ্‌ছি এর ভিতরেও এসে পড়েছে। মাতালের আর যা-ই দোষ থাক্‌—সত্য কথা সে অত্যন্ত সোজা ভাবেই ব'লে যায়। আমার চিঠি প'ড়ে ঘা পাবেই। কিন্তু কোথাও যদি অনর্থক ঘা দিয়ে থাকি, মাপ ক'রো ভাই, মাপ ক'রো। ......

মণ্টু পত্র পড়ার আনন্দেই মগ্ন ছিল। তাই সে তার দিদির দিকে এতক্ষণ একবারও তাকিয়ে দেখেনি।

এইবার পত্র শেষ ক'রে আদর কাড়্‌বার লোভে দিদির দিকে ফিরে তাকাতেই সে দেখ্‌তে পেলে, তারি কোলের পাশটাতে তার দিদি মূর্চ্ছাহতের মতো প'ড়ে রয়েছে। তার মুখের দীপ্তি নিভে গেছে, একটা বেদনার ছাপ সেই রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের উপর এমন ভাবেই ফুটে' উঠেছে যে, মণ্টুর মতো ছেলেমানুষের চোখেও দুঃখের তীব্রতার ইঙ্গিতটুকু চাপা রইলো না। সে তাড়াতাড়ি দিদির মাথাটা কোলের উপর তুলে' ধ'রে চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে—সাবিত্রী-দি !

*
* *

দোল-পূর্ণিমার রাত ! বসন্তের যৌবন-শ্রীর সমস্ত সৌন্দর্য্য মদের ফেনার মতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে' আকাশে যে বান ডাকিয়েছে, মানুষের মন তারি খানিকটা পান ক'রে একেবারে মাতাল হ'য়ে উঠেছে। বাতাসের ভিতর মায়াপুরীর মনোহরণের বাঁশী বাজ্‌ছে। জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউগুলোর উপর দিয়ে রহস্য-লোকের মায়া-কন্যারা নেচে চলেছে কোথায় কোন্ মনোরাজ্য জয় কর্‌বার জন্যে, কে জানে !

মায়া-মৃগ

রাত ঘন হ'তে ঘনতর হ'য়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার ভিতরকার নেশাও যেন জমাট বেঁধে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বিছানার ভিতর প্রতিভা অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে ছিল, নির্জ্জীব আড়ষ্টের মতো। কিন্তু ঘুমহীনার ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাক্‌বার মতো দুঃখ আর নেই—বিশেষতঃ এমন রাত্রিতে, যখন মনের দোলায় সমুদ্রের কাঁপন জেগে ওঠে।

প্রতিভা নিঃশব্দে শয্যা ত্যাগ ক'রে তার জানালার তলে এসে দাঁড়ালো। প্রতি দিনের অভ্যাসের ফলে এই হতভাগিনীর কাছে কেবলমাত্র এই রাস্তাটুকুই পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল। জানালার ধারে ব'সে দৃষ্টিহীন চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকাতেই তার কানে এসে বাজ্‌লো পাড়ার হিন্দুস্থানীদের হোলীর গান—

'হো—হো—নন্দ-দুলালা'—

কি আনন্দ-উৎসবের রেশ লেগেছে এদের মনে! দম্‌কা হাওয়ার মতো তাদের গতি লঘু হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত দিন-রাত্রি ধ'রে তাদের চলারো বিরাম নেই—গানেরো বিরাম নেই। ফাগের রেণুতে পথের ধূলি রাঙা হ'য়ে উঠেছে, দেহ রাঙিয়ে গেছে, মনের মেঘেও রাঙা বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। তাতে আলো আছে, কিন্তু বজ্রের জ্বালা নেই।

রিক্তা

প্রতিভার মনে হ'লো, ফাল্গুনের এই বসন্ত রাত্রিটি তার চিত্তের দুয়ারেও কতবার কত রকম ক'রে নেমে এসেছে। কত রেখা এঁকে গেছে তার মনের উপরে। একটির পর একটি ক'রে স্মৃতির পুঁথিখানা মনের চোখের সাম্‌নে মেলে ধ'রে সে তাই পড়্‌তে লাগ্‌লো। সে যে কেবল হাসি গান আর উৎসবের অভিসারের কথা!

তার মনে হ'লো, জ্যোৎস্নার অফুরন্ত জোয়ারের ভিতর প্রভাতের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে ফাগুন পূর্ণিমার গান—

"ফাগুন লেগেছে বনে বনে,
ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় গো
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।"

আকাশ হয়তো আজও রঙিন হ'য়ে উঠেছে, গানে-গানে হয়তো উদাস নিখিলের অন্তরও ভ'রে গেছে। কিন্তু কই, তা'র মনে চল-চঞ্চল নব-পল্লবদলের মর্ম্মর তো জাগ্‌ছে না! মনের সেই দখিণ হাওয়া—পথিক হাওয়ার সাড়াও তো আজ তার কাছে আসেনি! আসে তো নাই-ই—কখনো যে আস্‌বে, তারো সম্ভাবনা নেই।

ফাল্গুন এলো, গন্ধে-উদাস হাওয়ায় তার উত্তরী হয়তো দুল্‌ছে, হয়তো কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী তার কানে, তার

হাসির আড়ালে যে আগুন ঢাকা রয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্ধের কাছে তার কিসের দাম আছে! অথচ এই ফাল্‌গুনেরি দেখা পাবার আশায় কত দিন ধ'রে সে যে ব'সে ছিল, 'পথ চেয়ে আর কাল গুণে!' হঠাৎ এই বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রিতেই যে তার আকাশ এমন ক'রে বজ্রের জ্বালায় জ্ব'লে উঠ্‌বে সে কি তা জান্‌তো?

কিন্তু কেন জানে নাই—সে তো তারি দোষ। সত্যই তো অন্ধকে নিয়ে কে কবে জীবনের উচ্ছ্বসিত যৌবনকে ব্যর্থ করেছে? তার যাচ্‌ঞা যদি স্বার্থপর হ'তে পেরে থাকে, তবে সে স্বার্থের ছাপ অন্মের অন্তরেই বা থাক্‌বে না কেন?

হঠাৎ তার মনে হ'লো—এ একরকম বেশ ভালোই হয়েছে। মিথ্যার যে নাগপাশ এত দিন ধ'রে তাকে 'অক্টোপাশে'র মত হাজার বাহু মেলে জড়িয়ে ছিল, তার হাত থেকে সে যে মুক্তিলাভ করেছে, সে তো তার দুঃখ নয়, সেই তো তার পরম লাভ। কত বড় অবাস্তব কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে সে যে এত দিন মাতামাতি করেছে, তাই মনে প'ড়ে, সেই নির্জ্জন রাত্রিতেও প্রতিভার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো।

সত্যের দেখা না পাওয়া পর্য্যন্তই মানুষ তাকে ভয়

ক'রে চলে। কিন্তু একবার দেখা পেলে, তা যত বড়ই নির্ম্মম হোক্ না কেন, মানুষের মন তার ভিতরেই আশ্রয় লাভ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঠে।

নিজের দিক থেকে সত্যের এই রূপটা প্রতিভার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তেই, তার মনে পড়্‌লো সাবিত্রীর কথা। কি অপূর্ব্ব ত্যাগ ও মনের দৃঢ়তা কুসুমের মতো কোমল এই মমতাময়ী রমণীটির। প্রেমাস্পদকে কাছে পায়নি ব'লে সে যখন দুঃখের চিতার জ্বালা নিজের বুকের ভিতর অনুভব ক'রে অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছিল, সাবিত্রী তখন তার নিজের প্রেমাস্পদকেই তার কাছে এনে দেবার চেষ্টা করেছে। আপনাকে এমনভাবে আহুতি দেবার সাধনা যখন মানুষ চোখের সাম্‌নে দেখে, তখন তার দুঃখ তুলনায় সত্য-সত্যই হাল্কা হ'য়ে পড়ে। দু'-হাত তুলে' প্রতিভা মনে মনে সাবিত্রীকে প্রণাম ক'রে তার অন্তরের দেবতাকে ডেকে বল্‌লে—হে ঠাকুর, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছ, কিন্তু আশ্রয় দিতেও দ্বিধা করনি—তোমারি জয় হোক্!

তারপর সে মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লে—দিদি, জেগে আছ?

সাবিত্রী জেগেই ছিল। ব্যথার এই স্তব্ধ মূক অথচ ক্রন্দনের বাণীর বিদ্যুতে ভরা মূর্ত্তিকে সাম্‌নে রেখে কেউ

কখনো ঘুমুতে পারে না। তাই প্রতিভা ডাক্‌তেই সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে বুকের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—চল্‌ ভাই, একটু ঘুমুবি চল্‌। রাত যে তিন-পহর গ'ড়ে গেছে।

—ঘুম কি আমারি একার দরকার দিদি! কিন্তু তুই ঘুমুস্‌নি ব'লে আমি তোকে কোনো রকমের অনুযোগ কর্‌ছিনে—আজ যে জেগে থাক্‌বারই রাত। ঐ শোন্‌, ও-পাড়ার হিন্দুস্থানীগুলো সারা রাত জেগে হুল্লোড় কর্‌ছে।

—আজ যে দোল-পূর্ণিমা, ওদের উৎসব, তাই তো ওরা ঘুমুতে পার্‌ছে না।

—দোল-পূর্ণিমার উৎসব কেবল তো ওদের নয় দিদি, বিশ্ব-মানবের। আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে—না দিদি? আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; কিন্তু তুই ভালো ক'রে চেয়ে দেখ্‌,—ও বান রিক্ততার বান। এত রিক্ততার মাঝে কি কেউ ঘুমুতে পারে?

—ওরে থাম্‌, থাম্‌! আর বলিস্‌নে, আমি যে আর সইতে পার্‌ছিনে।

প্রতিভা দু'টো হাত দিয়ে সাবিত্রীকে আরো একটু নিবিড় ক'রে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললে—ছিঃ

দিদি, তুই কাঁদছিস্! রিক্ততা মানেই তো দুঃখ নয়। ঐ যে চাঁদ, ও তো আপনাকে একেবারে রিক্ত ক'রেই দিয়ে যাচ্ছে। তবু ও-তো কাঁদ্‌ছে না; ওর হাসির পাথারেই জোয়ার জেগেছে। নিজে তুই আপনাকে এমন ভাবে রিক্ত ক'রে দিয়েছিস্ যে, তা জান্‌বারও সুযোগ দিলিনে—তবু রিক্ততার নামে তোর চোখে জল আসে?

—কিন্তু তবু তো তোকে সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না।

—সুখের চেয়ে ঢের বড় জিনিষ যে তুই দিয়েছিস্, তাই তো সুখী কর্‌তে পার্‌লিনে। সুখটা নেহাৎ আমাদের এই মাটির বস্তু। কিন্তু তুই যা দিয়েছিস্, তা যে মাটির ঢের উপরের জিনিষ। জানিস্ দিদি, আমার আজ কি মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে, এ-জন্মে আমি তোর বোন্ হয়েছি, কিন্তু আর-জন্মে তুই আমার মা ছিলি।

সাবিত্রী একেবারে কান্নায় ফেটে প'ড়ে ব'লে উঠ্‌লো—সর্ব্বনাশি, এতেও তোর সাধ মেটেনি! তুই আমার বুকটাকে মুচ্‌ড়িয়ে, দুম্‌ড়িয়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিতে চাস্!

বৃষ্টির পর রৌদ্র প'ড়ে আর্দ্র ভেজা পল্লবগুলো যেমন

হাস্‌তে থাকে, অথচ সেই হাসির ভিতর হ'তে করুণ বেদনার রেখাটাও একেবারে মুছে' যায় না—অশ্রু-ছল্‌-ছল্‌ অন্ধ চোখ্‌ দু'টো হাসিতে ভ'রে নিয়ে প্রতিভা বল্‌লে—না দিদি, আর তোকে দুঃখ দেবো না, এইবার চল্‌ ঘুমুতে যাই।

□